আনন্দ-নাট

আনন্দ-নট

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ :
ফাল্গুন, ১৩৬৪

●

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্-সি.
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট্
কলিকাতা ৬

●

প্রচ্ছদপট :
শ্রীসুমুখ মিত্র

●

ব্লক প্রস্তুতকারক :
ব্লকম্যান (প্রসেস্)
৭৭।২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

●

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :
শ্রীগুরু আর্ট প্রেস
৫০বি, মধু রায় লেন
কলিকাতা ৬

●

মুদ্রক :
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬, চালতা বাগান লেন
কলিকাতা ৬

●

মূল্য—তিন টাকা

মিশ্র ডায়েরী

ঘুরে ফিরে যখন গঙ্গার ধারটিতে এসে বসলাম তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আমার পেছনে পড়ে রয়েছে ডায়মণ্ডহারবার শহরটা। রাস্তাটাই হচ্ছে বাঁধ। উত্তরে একটু এগিয়ে গেলে এই বাঁধের নীচে বাঁদিকে পড়বে থানা আর আদালতের বাড়িগুলা। ডান দিকে সারি সারি দোকান। আরও এগিয়ে বড় খালটা। পুল পেরিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে নূতন বসতি, সম্ভ্রান্ত পল্লী ; ডায়মণ্ডহারবারের বালিগঞ্জ। একমুঠি শহর ডায়মণ্ডহারবার শেষ হয়ে গেল।

বেশ লাগে কিন্তু। যখনই আসি, দেখি কিছু-না-কিছু বেড়েছে। কলকাতাও বাড়ছে। বেড়ে হচ্ছে বিকৃত, শ্রীহীন ; ডায়মণ্ডহারবারের বৃদ্ধিটা শ্রীবৃদ্ধি ; এই জন্যে ওখানে হাঁপিয়ে উঠলে এখানে আসি ছুটে মাঝে মাঝে কয়েক ঘণ্টার জন্য ; রেলে এসে বাসে ফিরে যাওয়া। জায়গাটাকে ভালবাসি বলে এখানে রাত কাটাতে চাই না, বাসা বাঁধতে চাই না। কে জানে, অতিপরিচয়ে আবার কি গ্লানি বেরিয়ে আসবে। ডায়মণ্ডহারবারের এইটুকু বাস্তবেই আমি সন্তুষ্ট ; বাকিটুকু আমার স্বপ্নে থাকে অম্লান অক্ষয় হয়ে।

ছবিটুকু মনের মধ্যে সঞ্চয় করে নিয়ে গঙ্গার ধারটিতে এসে বসেছি। আমার শেষ বাস আটটায় ; এখনও দেরি আছে।

ঘুরে ফিরে এসে এই জায়গাটিতে বসবার আমার সময়ও এই। এইখানে ডায়মণ্ডহারবারের বাস্তব আর স্বপ্ন মিলেছে সবচেয়ে নিবিড় হয়ে, যেমন নিবিড় হয়ে মিলেছে দিনের বাস্তবের সঙ্গে সন্ধ্যার স্বপ্ন। এখানে এসে আমি বসি স্থান আর কালের ত্রিবেণী সঙ্গমে। চতুর্বেণী বলাই ঠিক, ত্রিবেণী কথাটা ব্যবহার করলাম চালু বলে, যুগযুগান্তের ট্রাডিশনপূত বলে।

আমার বাঁদিকে এই প্রশান্ত বাঁধের রাস্তা সোজা চলে গেছে কাকদ্বীপ, তার মানে নিবিড় সুন্দরবন আর অনন্ত সমুদ্রের যাত্রী। সামনে আমার বিরাট বিস্তৃত নদী, নিতান্তই একটি ক্ষীণ বনরেখা তাকে অনন্ত আকাশের সঙ্গে করেছে পৃথক্, সন্ধ্যা আর একটু গাঢ় হয়ে এলেই সে পার্থক্যটুকু যাবে ঘুচে।

অনন্তের সঙ্গে আরও একটা যোগ অনুভব করি যখন এখানটিতে এসে বসি,—

আমার বাঁয়ে প্রসারিত থাকে দক্ষিণ, সামনেও প্রসারিত থাকে তারই সোদর —অস্তরাগ-লাঞ্ছিত পশ্চিম।

সন্ধ্যার ছায়া আরও গাঢ় হয়ে আসতে ওপারের নীল তটরেখা মুছে গিয়ে নদীর ওদিকটা হয়ে উঠল সীমাহীন। আকাশে যা একটু মলিন লালচে আভা লেগে ছিল সেটুকুও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল; সন্ধ্যাতারাটা হয়ে উঠল দীপ্ত। অদূরে খেয়াঘাট থেকে একটি নৌকা বোধ হয় সন্ধ্যার ট্রেনের যাত্রী নিয়ে ওপারের দিকে পাড়ি জমাল। আরও কেউ যাবে নাকি?—পাল তুলে দিয়েও জড়ানো আওয়াজে গোটাকতক ডাক দিল মাঝি—বোধ হয় ওপারেরই কয়েকটা জায়গার নাম করে। আজ হাওয়া একটু জোরই, আকাশে কয়েক খণ্ড মেঘও রয়েছে, বোধ হয় এই শেষ খেয়া।···একটি যাত্রীবাহী নৌকা ঢেউয়ের দোলা খেতে খেতে এগিয়ে আসছিল—মাঝগঙ্গায় একটি ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে আস্তে আস্তে বড় হতে হতে; সেটিও এসে খেয়াঘাটের নৌকার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনন্তের দু'দিক থেকে এই যে যাওয়া-আসার নিত্যলীলা এর কথা ভাবতে ভাবতে অনেকখানি আত্মবিস্মৃতই হয়ে পড়েছি, এমন সময় একটি ভদ্রলোক আমার বেঞ্চিটার পাশটিতে এসে বসলেন।

বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে, সুপুরুষই এবং সু-স্বাস্থ্য। এদিকে ভাবটা যেন একটু বিষণ্ণ, কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে যেন একটু অন্যমনস্ক রয়েছেন, এবং মনে হ'ল ভেতরে ভেতরে একটু অধৈর্যও।

গায়ে পড়ে আলাপ করা আমার অভ্যাস নয়, তবে প্রায় জনহীন জায়গায় পাশাপাশি দুটি লোক একেবারে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকাটা অস্বস্তিকর, তা ভিন্ন ভদ্রলোক এমন মনমরা হয়ে বসে আছেন, মনে হ'ল দুটো কথা কয়ে একটু অন্যমনস্ক করে দিলে বোধ হয় সেটা ভালোই হয়। একটা আলাপের সূত্র ধরতে যাচ্ছিলাম। উনিই হঠাৎ একটু মুখটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন—"আপনি কি এখানকারই লোক?"

বললাম—"না, আমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ি এখানে; এসেছি।"

কথাটা মিথ্যা, একেবারে ষোল আনাই; কেননা যার মূলেই স্ত্রী নেই তার কন্যা থাকতে পারে না, এবং যার কন্যা নেই তার কন্যার শ্বশুরবাড়ি থাকতে পারে না। কিন্তু কোন কাজ নেই, ডায়মণ্ডহারবারের মত একটা অকিঞ্চিৎকর জায়গায় শুধু ঘণ্টা দু'তিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি, এ ধরনের সত্যভাষণে

শ্রোতার কৌতূহল উদ্রেক করে এমন অবস্থায় পড়তে হয় যে, শেষে হাজারটা মিথ্যা না এনে ফেললে আর সামলে উঠতে পারা যায় না। অনেক অভিজ্ঞতার পর দেখেছি গোড়াতেই এ ধরনের একটি নির্জলা মিথ্যায় বেশ কাজ হয়।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—"আপনার নিজের মেয়ে?"

বেশ একটু সচকিত হয়েই ফিরে চাইলাম মুখের দিকে। হঠাৎ এ ধরনের প্রশ্ন? আমি যে অকৃতদার এটা জানলেন কি করে? দৈবজ্ঞ নাকি? একটু বেশ অপ্রতিভও হয়ে পড়েছি। তবে সে ভাবটা চেপে হেসে বললাম—"পরের মেয়েকে নিজের বলে চালাতে অন্য কোথাও সাহস হলেও তার শ্বশুরবাড়িতেও চালাতে গেলে…"

ভদ্রলোকই এবার অপ্রতিভ হয়ে গেলেন, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন—"না, না, সে কথা বলছি না…মানে—মানে…"

বার দুই এই রকম আমতা আমতা করে হঠাৎ আগের মত বিষণ্ণ-গম্ভীর হয়ে বললেন—"একটা ব্যাপার হয়েছে…বড় দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি তাইতে…"

"কি ব্যাপার!"—আমি বেশ উদ্বিগ্ন হয়েই প্রশ্ন করলাম।

"আমার একটি মেয়ে আসবে, ওপারে সুহৃৎগঞ্জে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে…"

আমি বাধা দিয়ে বললাম—"কিন্তু আর কখন আসবে?"

"আসবেই; আসতেই হবে তাকে, আর সেইটেই হয়েছে ভাবনার কথা। দেখে এলাম, এইমাত্র যে নৌকোটা এল তাতে আসে নি। এর পরে আসা মানে…অবিশ্যি পাড়ি এখানে রাত করেও জমায়, কিন্তু আজ যে রকম আকাশের অবস্থা…"

কথাটাকে স্পষ্ট করতে ভয় পেয়েই যেন দু'বার থেমে থেমে গেলেন। একটু চুপচাপ যে গেল তার মধ্যে পকেট থেকে একটা ছোট্ট ডিবে বের করে বাঁ হাতে একটু নস্য ঢেলে নাকে চালান দিলেন। তারপর সামনে একটু মুখটা বাড়িয়ে সন্ধ্যার ছায়ার মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিটাকে ঠেলে আমায় প্রশ্ন করলেন—"দেখুন ত দূরে নৌকোর মতন কি কিছু নজরে ঠেকছে? আমার দৃষ্টি এখন আর বেশীদূর যায় না।"

বললাম—"না, কিছুই নেই।…ঢেউগুলোর জন্যে মনে হচ্ছে ও রকম। আপনি কিন্তু নিশ্চিন্দি থাকুন। এরকম আকাশ দেখে কোন মাঝিই নৌকো ছাড়বে না। বিশেষ করে মেয়েছেলে নিয়ে।"

"কিন্তু ছাড়তেই হবে, ঐ মেয়েছেলে রয়েছে বলেই।"

আমায় মূঢ়ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করলেন—"আপনি নিয়তি বলে জিনিসটাকে বিশ্বাস করেন না?"

একটু যেন কেমন কেমন ঠেকছে। আমি উত্তর করলাম—"করি। কিন্তু তার চেয়ে বেশী করি মানুষের বিচার-শক্তিকে।...আপনি অযথাই বড় বেশী ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন যেন; এটা ঠিক নয় ত।"

ভদ্রলোক আমার যুক্তি থেকে কিছু সাহস সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছেন কিনা বুঝতে পারলাম না, তবে একটু চুপ করে রইলেন; তারপর হঠাৎ কতকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বললেন—"আমি রেবাকে ঠিক এইখানটিতে একদিন এই রকম সন্ধ্যায় কুড়িয়ে পাই; সেদিনও নদী এই রকম...এখুনি সে রকম হয়ে উঠবে আর কি..."

আশ্চর্য নিয়তি বন্দী ত। আমি কথাটা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলাম—"আপনার নিজের মেয়ে নয় তা' হলে?"

ভদ্রলোক বললেন—"মাপ করবেন। আমি অকৃতদার। নিজের মেয়ে নয় বলেই তখন আমি ওরকম একটু অভদ্র ভাবেই প্রশ্নটা করে বসি আপনাকে। এর জন্যেও ক্ষমা চাইছি। এটা একটা রোগে দাঁড়িয়ে গেছে আমার,—কারুর মেয়ের কথা শুনলেই ফস্ করে যেন আপনি মুখ থেকে বেরিয়ে যায়—আপনার নিজের মেয়ে? বড় লজ্জায় পড়ে যাই, আপনার কাছে ত তবু ক্ষমা চাইবার সুযোগ পাওয়া গেল একটা, সব ক্ষেত্রে ত পাওয়াও যায় না..."

হেসে বললাম—"ক্ষমা চাইবার আর কি হয়েছে এতে?..."

ভদ্রলোক ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি ঠেলে একটা উদ্বিগ্ন নিঃশ্বাস মোচন করে বললেন—"না, ঢেউই।"

আমার কথাটা বোধ হয় কানে যায় নি। ডিবেটা বের করে এক টিপ নস্য নিলেন—বেশী বিচলিত হলে ওটা বোধ হয় ওর অজ্ঞাতসারেই হয়ে যায়—তার পর নিজের কথার জের ধরেই বলে চললেন—"নিজের মেয়ে কি জিনিস জানি না বলেই কথাটা বেরিয়ে যায় আমার মুখ দিয়ে। আমি রেবাটাকে সত্যি বড় ভালবাসি মশাই। আমি নিজে সংসার করি নি—এর পরে আর করবার সাহসও নেই। কিন্তু ঢেউয়ের দয়ায়—দয়াই বলুন বা নিষ্ঠুরতাই বলুন—কুড়িয়ে পাওয়া এই মেয়েটাকে নিয়ে আমার এতই ভালবাসার একটা অশান্তি যে, আমার মনে

সর্বদাই একটা প্রশ্ন লেগে থাকে—তা' হলে যাদের নিজের মেয়ে আছে, তাদের কি করে দিন কাটে! আচ্ছা আপনার পুত্রসন্তান আছে?"

মিথ্যাটা যথাসম্ভব ছোট করেই বললাম—"আছে···একটি।"

"মেয়ে?"

"দুটি।"—মনে হ'ল সবই একটি বলতে গেলে মিথ্যাটা যেন ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কোথায়।

"তিনটির মধ্যে ছেলে মাত্র একটি, তা' হলে ত আপনি আরও ঠিক করে বলতে পারবেন—আচ্ছা, আপনারা কি ছেলের চেয়ে মেয়েকে বেশী ভালবাসেন?"

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় পরোক্ষ যুক্তির আশ্রয় নিলাম, বললাম—"দেখেছি মেয়ের উপর টানটা যতদিন থাকে ততদিন ছেলের চেয়ে বেশীই থাকে, অর্থাৎ যতদিন না শ্বশুরবাড়ি গিয়ে চোখের আড়াল হচ্ছে, তারপর স্বভাবতঃই কমে আসবার কথা ত?"

"তাই আমিও ভেবেছিলাম। কিন্তু কৈ? বিয়ে দেওয়ার পর এ যে আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে। পরের মেয়ে নিয়ে এ কি জ্বালা বলুন ত? চোখের আড়াল হয়েছে, কোথায় নিশ্চিন্দি হব, না আরও অষ্টপ্রহর অশান্তি।"

প্রশ্ন করলাম—"কি ধরনের অশান্তি?"

ভাবলাম, মনস্তত্ত্বের ব্যাপার, দেখি যদি কোন চিকিৎসা বাতলাতে পারা যায়।

উত্তর হ'ল—"মনে হয় হারাব। যেমন কোথা থেকে কে হাতে তুলে দিয়ে গেল, তেমনি কোথা থেকে কে এসে নিয়ে যাবে···"

ভদ্রলোক চঞ্চল হয়ে এক টিপ নস্য নিলেন। তন্ময়-করা আমাদের অদ্ভুত আলোচনার মধ্যে ইতিমধ্যে আকাশের খণ্ড মেঘপুঞ্জ স্থানে স্থানে যুক্ত হয়ে উঠেছে। হাওয়াটা একটু বেড়েছে, বাঁধের পাকা শানের গায়ে ঢেউয়ের আছড়ানি গেছে বেড়ে। নদীর অর্ধেকটাও আর দেখা যায় না।

বেশ বিচলিত হয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক। হাতটা ঝেড়ে বললেন—"অন্য কেউ নয়—এই ঢেউ। এই ঢেউই সেদিন যেমন তুলে দিয়েছিল হাতে, তেমনি কেড়ে নেবে···"

মুশকিলে পড়া গেল। এ দৃশ্য থেকেই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার ভদ্রলোককে। বললাম—"বড় বেশী ভালবাসেন মেয়েটিকে, তাই আপনার ও রকম মনে হচ্ছে। চলুন ওঠা যাক। আজ আর কখনও আসে?"

"আসবেই···আমাকে হারাতেও হবে আজ···"

চোখ দুটো অন্ধকারেও দীপ্ত হয়ে উঠেছে। কাঁপছেন একটু একটু। আমি পিঠে হাত রেখে আশ্বাস দিয়ে বললাম—"এত অন্ধের মতন নিয়তিকে মেনে নিতে আছে?—এ যুগে যখন প্রত্যেক ব্যাপারেরই একটা বিজ্ঞানসম্মত কারণ···"

"তা যদি না হবে ত তাকে এই নদীর ওপারেই বিয়ে দিতে গেলাম কেন? না দিয়েই পারা গেল না কেন? এ নদীকে, এ জায়গাটাকে আমার এত ভয় করা সত্ত্বেও?···বলুন।"

নাকে নস্য টিপে ধরলেন।

বিমূঢ় হয়ে গেছি, এ বাতুলতার কি উত্তর দিই?···তারপরেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিউরে উঠলাম। নদীর যেটুকু দেখা যাচ্ছে তার ওদিকে অন্ধকারের গহ্বর থেকে একটা করুণ আর্তনাদ—"বাবা!···"

ঝড়ের দোলায় দোল খাওয়া, টানা, দীর্ঘ; আর নিঃসংশয় ভাবে স্পষ্ট!

উঠে দাঁড়িয়েছেন ভদ্রলোক। ডান হাতটা আওয়াজ লক্ষ্য করে গঙ্গার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—"ঐ শুনুন, শুনছেন?··ডাকছে!···কি হ'ল?···কি ওটা দেখুন ত!···নৌকো নয়?···ঐ যে সাদা পাল উলটে পড়ল, ঐ!···ঐ!—"

নৌকার পাল নয়। যেখান থেকে অন্ধকারে লুপ্ত তার ঠিক এদিকে সংঘর্ষ লেগে দুটো ভেঙে পড়ল! বললাম। বলতে বলতেই উঠে পড়েছি কিন্তু, এগিয়ে সামনে ঝুঁকে চোখ দুটো ঠেলে দিয়েছি। নৌকা নয়, কিন্তু শব্দটা স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট যেন—"বাবা!···বাবা!···বাবা!···গেলুম!—"

শেষ আকূতি ঝড়ের শব্দটাকে যেন ঠেলে উঠেছে। তারপরেই সমস্ত শরীরটা আবার নূতন করে ছমছম্ করে উঠল—কানের পাশেই "যাই মা!—আসছি!···"

আমি ঘুরে শক্ত করে ওঁর একটা হাত ধরে ফেললাম, একটু রুক্ষভাবেই প্রশ্ন করলাম—"কোথায় যাবেন?"

অদ্ভুত এক বিমূঢ় দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। সব চেয়ে আশ্চর্য সে উগ্র উৎকণ্ঠার ভাবটা একেবারেই নেই আর, সে কম্পন নেই, বাঁ হাতে নস্যের ডিবেটাও শিথিল ভাবে ধৃত। একটু চেয়ে থেকে ফিরলেন, একটু হাসি ঠোঁটে করে বললেন—"না, ও ত যাবেই—কি হবে গিয়ে আর?"

সমস্ত শরীরটা আলগা হয়ে গিয়ে বেঞ্চে বসে পড়লেন।

ওর হতাশ নিষ্ক্রিয়তাই আবার হঠাৎ আবার সাড়া এনে দিলে শরীরে;

যথাসাধ্য ত করতে হবে, মৃত্যুর সামনে জীবনের প্রতি জীবনের শেষ কর্তব্য, বৃথা জেনেও। খেয়াঘাটের দিকে পা বাড়ালাম।

এবার উনি উঠে আমায় ফেললেন ধরে।

"কোথায় যান?"

বললাম—"দেখি যদি দু'একটা নৌকো বের করে দিতে পারি।"

"আমার কথা এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না?···বেশ, দেখুন" বলে নিতান্ত নির্লিপ্ত-ভাবে হাতটা আলগা করে দিয়ে বসে পড়লেন।

ছুটেছি। সংগে সেই আর্ত কণ্ঠ। কয়েকটা লাফেই খেয়াঘাটে নেমে পড়লাম, কি রকম হয়ে গেছি একেবারে।

"ওগো, তোমরা নৌকো খুলে দেবে না? শুনতে পাচ্ছ না ডাক?"

কয়েকটা নৌকার মাল্লা ছৈয়ের মধ্যে থেকে একটু ত্রস্তভাবেই গলুইয়ে এসে দাঁড়াল।

"কৈ বাবু?···ও ত বাতাসের শব্দ—তুফান উঠবে এখুনি।"

"আমি স্পষ্ট শুনছি—বাবা! ··বাবা!···গেলুম!" সেই শব্দটাই যেন আকাশ-বাতাস ছেয়ে রয়েছে।

"কি আশ্চর্য!···শুনতে পাচ্ছ না তোমরা! কারুর কানে যাচ্ছে না—বাবা! —বাবা! ··গেলুম···ঐ ত···।"

"কৈ বাবু?···ও ত হাওয়া।···মানষের আওয়াজ চিনব না?"

"তোমরা যাবে না। তোমরা ভীতু! তোমরা মানুষ নয়।···"

রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে বকেই চলেছি যা মুখে আসছে। জড়াজড়ি করে কি সব হালকা মন্তব্য করতে করতে ওরা যে যার কাজে চলে গেল!

যাবে না। একটা অসহ্য অবস্থা, লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম একটা নৌকায়, জোর করে কিছু একটা করতেই হবে, কিন্তু পা বাড়িয়েই হঠাৎ মনটা আবার ঘুরে গেল। যে হাতে আছে এখনও, তাকে ছেড়ে দিয়ে যে সত্যই নিয়তি-কবলিত তার দিকে হাত বাড়িয়ে একি ভুল করতে বসেছি!

কিন্তু তখন ভুলের যা হবার হয়ে গেছে। এসে দেখি বেঞ্চিটা শূন্য, কেউ নেই, শুধু ছড়িগাছটা বেঞ্চিতে আগের মতই ঠেস দিয়ে রাখা রয়েছে।

আনন্দ-মট

ক'দিন থেকেই মনটা বড় খারাপ রয়েছে, কিছুই ভাল লাগছে না।

এই রকম কিছু না-ভালো লাগার অবস্থায় বাইরে থেকে একটু বেড়িয়ে আসি; বেশীরভাগ ডায়মণ্ডহারবারের ওদিক থেকে।

ডায়মণ্ডহারবার কিন্তু বোধ হয় চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল আমার কাছে। জাহাজ, খাল, প্রশস্ত গঙ্গা, গঙ্গার ধারের বিস্তীর্ণ রাজপথ—কিছুই আজ টানে না; মনে পড়ে যায় মাঝ-গঙ্গা থেকে সেই করুণ আহ্বান, আর সেই শূন্য বেঞ্চি।

এবার ফিরে যাব ঠিক করেছি। বসুধা আপিসে একটা কাজ ছিল, ভাবলাম আজ গিয়ে সেরে ফেলি ওটা। আমি আর আমার এক বন্ধু পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে আছি। সামনে সম্পাদক; টেবিলে বাঁদিকে রয়েছেন লালকুঠির রাজা শিকার-পোশাকে। শিকারের গল্প হচ্ছে।

ডান দিকের ভদ্রলোকটিকে আমি চিনি না, কিন্তু মনটা যেন বড় আকর্ষণ করছেন। বেশ গোলগাল চেহারাটি, সাহেবী স্যুট পরা, বয়স চল্লিশের ভেতর। আমাদের মত গল্পই শুনছেন, মাঝে মাঝে এক-আধটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

সম্পাদক জিজ্ঞেস করলেন, ওঁকেই—"কৈ, আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে ট্রাঙ্ক-কনেকশানটা পেলেন?"

"না, এখনও..."

সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিং-ং-ং করে টেলিফোনের ট্রাঙ্ক কলের টানা ঝনঝনানি। "এই যে, এসে গেছে"—বলে ভদ্রলোক এগিয়ে মাউথপীসটা তুলে নিলেন।

"Hallo! Is that the President?" (ইজ দ্যাট দি প্রেসিডেন্ট?)

সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির কণ্ঠস্বরও ভেসে এল, অতি ক্ষীণ, কিন্তু স্পষ্ট—

"Speaking" (স্পীকিং)।

"This is Sorkar. Arranging a tour of the U. S. A. Could you help?" (দিস ইজ সোরকার। অ্যারেঞ্জিং এ টুর অফ দি ইউ-এস এ। কুড্ ইউ হেল্প?)

"Sure" (শ্যুওর)।

"Thanks" (থ্যাঙ্কস)।

"No mention" (নো মেনশ্যান)।

মিশ্র ডায়েরী

রিসিভারটা রেখে দিয়ে গম্ভীরভাবে আবার চেয়ারটাতে বসে পড়লেন। অতি চমৎকার কাটা কাটা ইংরেজী। একেবারে নিখুঁত স্টাইল।

মনে হ'ল আর সবাই-ই চেনেন, তেমন কোন বিস্ময়ের ভাব নেই। অস্বীকার করব না, আমি শুধু বিস্মিতই নয়, বেশ একটু অভিভূত হয়ে পড়েছি। এত দূরের ট্রাঙ্ক-টেলিফোন কখনও শোনা নেই, তার উপর একেবারে প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ারের সঙ্গে !···এমন অবস্থা হয়েছে যে, অসঙ্গতিটুকু ধরবার ক্ষমতাও সাময়িক-ভাবে হারিয়ে বসে আছি।

সম্পাদক আমার বিমূঢ় ভাবটা বেশীক্ষণ থাকতে দিলে না, পরিচয় করিয়ে দিলেন—"বিশ্বখ্যাত যাদুসম্রাটের ভাই।"

বিমূঢ় ভাবটা কিন্তু অত শীঘ্র ত যাওয়ার নয়, আমি ওঁকেই প্রশ্ন করলাম—"কবে যাচ্ছেন আপনি আমেরিকায় তা' হলে ?"

যাদুকর শুধু একটু ঠোঁট চেপে হাসলেন। আরও সবাই। সম্পাদক আবার একটু হেসে বললেন—"কথাটা প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে হয় নি, ওদিকেও ইনি, এদিকেও উনি।"

"মানে ?···"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটাও নিজের কাছেই পেয়ে গেছি, নস্য নেওয়ার অজুহাতে মুখের কাছে হাত নিয়ে যাওয়ার রহস্যও। প্রশ্ন করলাম—"ভেন্‌ট্রোলোকিজম ?"

যাদুকরের দিকেই চেয়ে প্রশ্নটা করেছি। উনি একটু হাসলেন। এত নিখুঁত হরবোলার অভিনয় আগে কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না। ঘণ্টিটা পর্যন্ত ওরই। মুখের দিকে দৃষ্টিটা কয়েকবারই ঘুরে ফিরে গিয়ে পড়তে লাগল। তার পরে একটা ব্যাপার হ'ল। প্রশংসার দৃষ্টিটা হঠাৎ যেন অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠল—দেখা মুখ নয় ?

আমার বিমূঢ় ভাবটার জন্যে টেবিল-মজলিসের কথাবার্তা একটু চেপে গিয়েছিল, আবার চালু হ'ল। বন্ধু বললেন—"এবার কিছু খেলা দেখান্; ইনি নতুন লোক···"

তাসের খেলা, রুমালের খেলা, টাকা ওড়ানো, সঙ্গে সঙ্গে রহস্যও পরিষ্কার করে দিয়ে যাচ্ছেন যাদুকর। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পশার সম্বন্ধে মন্তব্যও করে যাচ্ছেন—অন্য সাধনার মতই সর্বদাই নিয়ে পড়ে থাকতে হয়—যখন যেটার সুবিধা সেই অনুযায়ী—নয় ত হাত নষ্ট হয়ে যায়, গলা নষ্ট হয়ে যায়···বোলচালের, সিচুয়েশন সৃষ্টির ক্ষমতা যায় কমে।

মাঝে মাঝে কানে যাচ্ছে মন্তব্যগুলো, একটানা নয়; কেননা আমি ভয়ানক অন্যমনস্ক হয়ে গেছি। সমস্ত মনটাকে জড়ো করেছি আমার স্মৃতির গোড়ায়।··· একটু একটু যেন আলো এসে পড়ছে কোথা থেকে। আমার চোখ আর কান একেবারে উদগ্র হয়ে উঠেছে—কণ্ঠস্বরের প্রত্যেকটি পর্দা, বলার প্রত্যেকটি ভঙ্গী··· দেখেছি—দেখেছি—হয় ত এত স্পষ্ট নয়, হয় ত আধা-আলোয়, কিন্তু দেখেছি ঠিক।···করবই বের। ভদ্রলোক যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ছেন আমার মনোনিবেশে, যেন—কি বলব?—লুকাতে চান?

"ভেন্‌ট্রোলোকিজমের রহস্য হচ্ছে···"

কি বলতে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, আমি আস্তে আস্তে ডান হাতটা বাড়িয়ে ওঁর বাঁ হাতের উপর রাখলাম, একটু গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা, গত রবিবার সন্ধ্যায়···আপনি ডায়মণ্ডহারবারে গিয়েছিলেন?"

যাদুকর ধরা পড়ে যাওয়ার ভাবে একটু লজ্জিত হয়ে হেসে মাথা দোলালেন।

আমার সমস্ত চৈতন্য যেন একটি চিন্তায় এসে জড়ো হয়েছে। প্রশ্ন করে চললাম—"সেই খেয়াঘাটের কাছে—মাঝগঙ্গায় সেই শব্দে—আপনার ডুবন্ত মেয়ের—আপনার পালিত কন্যার···"

সবাই কুতূহলী হয়ে মুখ বাড়িয়ে এসেছেন। বাইরে থেকে একজন কর্মচারী এসে বললেন—"মেয়েরা সবাই এসে গেছেন, ডাকছেন।"

পাশের ঘরেই বাড়ির মেয়েরা এসেছেন। যাদুকর একটা বৈঠকী অভিনয় দেবেন; হাতের খেলা, হরবুলি···

উঠে পড়ে আমার পিঠে একটা হাত দিয়ে আবার একটু হাসলেন। বললেন—"প্র্যাক্‌টিশ।···কিন্তু বড় শক্ দিয়ে ফেলেছিলাম আপনাকে সেদিন, মাফ করবেন।"

বার-দুই মুখটা ঘুরিয়ে হাসতে হাসতেই বেরিয়ে গেলেন।

বলী ও বজরংবলী

রিপোর্ট যা পেয়েছি তা ভুল নয়।

কালীবাড়ির চৌহদ্দিটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ফটক দিয়ে প্রবেশ করেই সামনে একটা প্রশস্ত উঠান, সেটুকু পেরিয়েই একটা কোঠা ঘর, সামনে একটু বারান্দা; মা তাইতেই অধিষ্ঠান করছেন। এই ঘর বা মন্দিরের দু'পাশে খানিকটা করে বাগান, যে সময়ের যা ফুল তার ব্যবস্থা থাকে, কায়েমীভাবে দুটি পঞ্চমুখী রক্তজবার গাছ। এই বরাবর দেখে আসছি। এবারে গিয়ে দেখি, উঠানের এককোণে, চৌহদ্দির দেয়াল ঘেঁষে সত্যই একটি মহাবীরজীর মন্দির উঠেছে; মাত্র বুক পর্যন্ত উঁচু, দরজাটি তদনুরূপ ক্ষুদ্র, বেশ একটু নীচু হয়ে দেখলে বিঘৎ দেড়েকের আগাগোড়া সিঁদুর মাখানো অঞ্জনানন্দনের ছোট্ট মূর্তিটি চোখে পড়ে। রামানুচরকে যথেষ্টই শ্রদ্ধা করি, তবুও, গোপন করবার চেষ্টা করব না, মনটা বেশ একটু বিষণ্ণ হয়ে গেল।

মায়ের মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আরও ব্যথিত হয়ে উঠল মনটা। হাঁড়িকাঠটা পোঁতা রয়েছে বটে তবে তাতে রক্তের ছিটে-ফোঁটাও লেগে নেই কোথাও; সকালে যে চালকুমড়াটা বলি দেওয়া হয়েছিল তার দুটো খণ্ড দু'পাশে আধ-শুকনো হয়ে পড়ে রয়েছে। মূর্তির দিকে চাইতে যেন চোখ ফেটে জল এসে পড়ে: কোথায় ললাটের সেই দম্ভ, চোখের সেই দীপ্তি, বরাভয়ের সেই ঐশ্বর্য? একটা নিস্তেজ করুণভাব যেন আপাদমস্তক সমস্ত অঙ্গখানি ছেয়ে রয়েছে। হাতের সেই বজ্রমুষ্টিও শিথিল, খড়্গ আর দৈত্যমুণ্ড কোন রকমে যেন রয়েছেন ধরে, যেকোন মুহূর্তেই খসে পড়তে পারে।

মূর্তি নিশ্চয় আগেকার মতোই আছে, যা শুনেছি এবং যা দেখেছি তারই ওপর আমার মনের প্রতিক্রিয়ার এমনটা বোধ হচ্ছে, তবুও কোন মতেই সান্ত্বনা পাচ্ছি না। নিজেরাই চেষ্টা করে দু'এক জায়গায় বলি প্রথা তুলে দিয়েছি; কিন্তু সে যেন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মায়ের সঙ্গে একটা রফা করে, মা যেন প্রসন্ন মনে সন্তানের আব্দারে নিজেকে করেছেন বঞ্চনা। এ কিন্তু মনে হচ্ছে একেবারে অন্যরকম ব্যাপার, মায়ের ওপর যেন একটা শাসন, মায়ের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা

হয়েছে, বঞ্চিত করা হয়েছে তাঁকে, পাছে শাসন-বিধি লঙ্ঘিত হয় সেজন্য ঐ কড়া পাহারার মধ্যে রাখা হয়েছে। নিজেই বন্ধ করিয়েছি কয়েক জায়গায়, কিন্তু এক্ষেত্রে যতই ভাবছি, মনটা ততই যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠছে; এভাবে কেন করা হবে বন্ধ?

মন্দিরের রকে বসে পূজারী-ঠাকুরের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, দিবানিদ্রা সেরে তিনি বৈকালের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হলেন। অনেক দিন পরে দেখা, কুশলাদি প্রশ্নের পর মন্দির খুলে একখানি কম্বল বের করে বারান্দায় পেতে দিলেন; দু'জনে উপবেশন করলাম। একথা সেকথা নিয়ে গল্প চলতে লাগল আমাদের। বয়োজ্যেষ্ঠ, এদিকে সিদ্ধ তান্ত্রিক ব'লেই জানি, যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, এতবড় যে একটা ব্যতিক্রম ঘটল তাঁর বর্তমানেই তার প্রসঙ্গটা কিভাবে তুলব মনে মনে ভাবছিলাম, উনি নিজেই এক সময় প্রশ্ন করলেন—"ঠাকুরবাড়িতে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলে? অনেকদিন পরে ত এসেছ।"

সুবিধাই হ'ল, একটু হেসেই উত্তর করলাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ, লক্ষ্য না করলেও চোখে পড়ে যান যে, যদিও চোখে না পড়বার মতন ক'রেই গুটিয়ে এনেছেন দেহটাকে। যোগসিদ্ধ ত।"

এর পরেই একটু কুণ্ঠিতভাবে প্রশ্নটা করে বসলাম—"কিন্তু যা শুনছি তা কি সত্যি ঠাকুরমশাই?"

একটু হাসলেন, বললেন—"তোমাব কানেও গেছে তা'হলে?···কথাটা যে সত্যি নয় তার একটা প্রমাণ এই যে নানা আকারে উঠেছে, যার যেরকম খুশি বানিয়ে বলছে। তুমি কি শুনেছ সেটাই না হয় শুনি আগে।"

বললাম আমি যা শুনেছি। মাড়োয়ারী পটির শেঠ মংনিরামের সঙ্গে পূজারী-ঠাকুরের বন্দোবস্ত হয়েছে, সে মন্দিরটা বছর বছর ভালো করে মেরামত করে দিয়ে যাবে, যাতে দেবতার নামডাক আরও ছড়িয়ে পড়ে। পীঠস্থানের মতো আয় হয় তারও চেষ্টা করবে, তার বদলে পাঁঠা বলিটা তুলে দিতে হবে মন্দির থেকে। ঠাকুরদেবতা নিয়ে কারবার, তায় মংনিরাম ব্যবসায়ী মানুষ, সমঝে বুঝে এগুনো অভ্যাস, আপাতত ঠিক হয়েছে এককোণে বৈষ্ণবকুলতিলক মহাবীরের ছোট্ট একটি মন্দির তুলে একটি ছোট্ট মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হবে। যদি দেখা যায় যে, বলি বন্ধ করায় কালীমাঈর বিশেষ আপত্তি নেই, নামডাক ছড়িয়ে পড়ছে, বেশী বেশী ক'রে পূজা পড়ছে, আয় বাড়ছে, তা'হলে মংনিরাম এর পর তাঁর

মন্দিরটা বড় করিয়ে মিনার কাজ-টাজ করিয়ে পীঠস্থানের উপযোগী করে দেবে ; মহাবীরজীর ব্যবস্থাটাও তদনুরূপ উন্নত করা হবে। যদি দেখা গেল কালীমাঈর মনঃপূত নয় নূতন বন্দোবস্তটা, তিনি বলি ছেড়ে দিতে নারাজ, অনিষ্ট হচ্ছে, তা'হলে ব্যবস্থাটা নাকচ ক'রে দেওয়া হবে, মহাবীর স'রে যাবেন, যথারীতি পাঁঠা এসে পড়বে আবার।

সবটা শুনে পূজারী-ঠাকুর আবার একটু হাসলেন, বললেন—"মংনিরামের কাজ অত কাঁচা নয়, তা'হলে শহরের মাঝখানে অমন ফলাও ব্যবসা ফেঁদে বসতে পারত না। ওর মহাবীরকে এখন ঠাঁইনাড়া করে কার সাধ্যি।"

প্রশ্ন করলাম—"কি রকম ?"

"কি রকম গোড়া বেঁধে কাজ দেখছ না ? মায়ের যত শক্তি সে তো ঐ ছাগ-মাংস আর ছাগ-রক্ত থেকে, তা সেটাই যখন বন্ধ তখন আর ভয়টা কিসের ? মা কালীর বারোটা বেজে গেছে এখানে, এখন ঐ মহাবীরজীরই জয়-জয়কার।"

হাসতে লাগলেন। বললেন—"সবে এসেছ অনেক দিন পরে, মহাবীরের আবির্ভাব নিয়ে অনেক গল্প শুনবে ঐ রকম, একসে এক চটকদার, মাথাটা ত আমাদের খুবই উর্বর।"

একটু চুপ করে থেকে বললেন—"মহাবীর এসেছেন অন্য পথে। অবশ্য মংনিরামেরই হাত ধরে এসেছেন, তবে পথটা মা নিজেই করে দিয়েছেন। সে আরও মর্মান্তিক কাহিনী।"

কাহিনীটা শুনলাম। পূজারী-ঠাকুর বললেন—"মায়ের পুজো যেমন আর পুজো নেই, শুধু উৎসব—আলো, বাজনা, নাচগান, আবৃত্তি, তারপর ঘটা ক'রে বিসর্জন—তেমনি বলিও আর বিধিমতো বলির মধ্যে ছিল না। প্রথমতঃ মংনিরামের দল ওখানেও ঢুকে পড়েছিল। মংনিরামরা যে মাড়োয়ারীই হবে তার মানে কি ? বাঙালী হতেই বা বাধা কি ? একদিন দেখলাম একটি ছোকরা, পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে, পুজো আরম্ভ হওয়ার আগেই একটা পাঁঠার দড়ি ধ'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রথম দু'তিন দিন কিছু বলল না। বলির সময় হলে উচ্ছুগু করে দিলাম, নিজেই খাঁড়া ধ'রে কাটল, তারপর চারটে ঠ্যাং বেঁধে নিয়ে চলে গেল। কেমন যেন ঠেকে একটু। একটা লোক রোজ বলি দিয়ে যাচ্ছে, এ কিরকম উগ্র মানসিক, এ কতদিন চলবে ? তারপর একদিন একটু কাঁচুমাচু হয়ে বলল—বলিটা গোড়ার দিকে সেরে নিলে হয় না ? অনেক-

দূর থেকে আসতে হয়।···সে কিরকম কথা! বলির একটা সময় আছে, তোমায় দূর থেকে আসতে হয় ব'লে তাড়াতাড়ি সব ছেড়ে ঐটেই আগে সেরে নিতে হবে? ···তখন কথাটা ভাঙল, কোন রকম মানসিকের বলি নয়ত, বাজারে একটা পাঁঠার ষ্টল নিয়েছে। বলি দেওয়া মাংস, চাহিদা বাড়ছে, বোধ হয় শিগ্‌গিরই দুটো ক'রে কাটতে হবে, তবে সকালের দিকেই টান বেশি, মন্তর-টন্তরের অত দরকার নেই; কপাটটা খুলে খাঁড়াটা বের করে দিলে ও নিজেই একটা কোপ বসিয়ে নিয়ে যাবে।

আপত্তি করলাম বৈকি—একি কাণ্ড, বলি, না ব্যভিচার! ···তার পরদিন জন চার-পাঁচ এসে উপস্থিত। সব ব্যবসা বিদেশীদের হাতে চলে যাচ্ছে, যখন একতিয়ার রয়েছে আমার, সাহায্য করব না কেন? আর অনুরোধ নয়, হুমকি। দেখে নেবে এমন কালীঠাকুর পাড়ায় কতদিন টেঁকতে পারেন।"

পুজারী-ঠাকুর মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। বললেন,—"ঘাঁটাতে সাহস হয়না, যুগ একবারে পালটে গেছে ত। দিলাম কয়েকদিন খাঁড়াটা বের ক'রে। মনের দুঃখ মাকেই জানাই, চারপো কলি এনে ফেলেছ মা, আমার আর দোষ কি? তারপর মা নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিলেন। ওরা ক'জন মিলে লিমিটেড কোম্পানী খুলেছে, বিক্রি বেড়ে গিয়ে একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে তিনটেয় দাঁড়াল, এতদূর থেকে কেটে নিয়ে যেতে বিস্তর অসুবিধে, রিক্সাভাড়াও লেগে যাচ্ছে, ওরা ষ্টলের পেছনেই একটা শ্যামামূর্তি বসিয়ে কাজ সেরে নিতে লাগল।

ও-ফাঁড়াটা এভাবে কেটে গেলেও সমস্যা কিন্তু মিটল না। সর্বনাশটা এই হয়েছে যে, লোকের ভক্তি-নিষ্ঠা এক দিক দিয়ে ক'মে গিয়ে, এক দিক দিয়ে যেন আরও বেড়েছে। ঠাকুর যখন একজন রয়েছেন তখন পাঁঠাটাকে এমনি জবাই না ক'রে একটা কোপ মেরে নিয়ে আসতে দোষটা কি?—ভাবটা কতকটা যেন এইরকম। ধর্মটা সস্তা হয়ে পড়ে একটা হুজুগে দাঁড়িয়েছে—যখন-তখন বলির পাঁঠা ডাক দিয়ে এসে হাঁড়িকাঠের সামনে দাঁড়াতে লাগল; ফীষ্ট হবে, কি বনভোজন হবে, কি কারুর ছেলের অন্নপ্রাশন—ছোট পাঁঠা, বড় পাঁঠা, শাদা পাঁঠা, কালো পাঁঠা, লাল পাঁঠা এক রকমারি কাণ্ড। অত দেখি না, মনের দুঃখ মনে চেপে খাঁড়াটা বের করে দিই; একদিন শুনলাম একটা খাশির ঘাড়ে কোপ মেরে নিয়ে গেছে। মনে মনে বললাম—মা, আর কত ভোগান্তি লেখা

আছে কপালে? 'জয় মা কালী' বলে বলি দিয়ে যাচ্ছে, সেটাও ত একটা মহামন্ত্রই।

বলতে পারি না ব্যাপারটা আসলে কি ছিল। তোমরা নিশ্চয় তোমাদের নতুন শাস্ত্রের কথা ধরে থাকবে—মনোবিজ্ঞান কি ঐরকম কিছু একটা; কিন্তু আমরা ত বংশ-পরম্পরায় মায়ের পূজারী, আমাদের বিশ্বাস ত অন্যরকম; বাড়তে বাড়তে ব্যাপারটা যখন একেবারে চরমে এসে ঠেকেছে, একদিন হঠাৎ মায়ের প্রত্যাদেশ হ'ল, মা যেন কত কাতর হয়ে এসে বলছেন—"বাবা নকুলেশ্বর···"

কিন্তু সেটা বলবার আগে, ব্যাপারটা কি হয়েছিল তাই বলি।

শরীরটাও তেমন ভালো ছিল না সেদিন, পুজো হোম সেরে উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেল, মন্দিরে তালা দিয়ে যখন বাড়ির ভেতর গেলাম ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। একটু ভোগ মুখে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। প্রায় আধঘণ্টাটাক হয়েছে, তন্দ্রার ঘোর এসেছে চোখে, এমন সময় বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারটি গলায় একসঙ্গে হাঁকাহাঁকি আর তারই মধ্যিখানে থেকে থেকে একটা পাঁঠার ডাক। ছেলেটাকে বললাম—"দেখতো গিয়ে কি ব্যাপার।"

এসে বলল—"বলি দেবে, আপনাকে ডাকছে।"

"তাই দিক এবার বেটারা, আর পারি নে।"—বলে মায়ের উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম করে বাইরে এলাম।

জন পাঁচ-ছয় জড়ো হয়েছে, মাঝখানে একটা কালো ছাগল, বোকা হয়ে গেছে, উৎকট গন্ধ ছড়িয়েছে। জিগ্যেস করলাম—"ব্যাপার কি? এই ছুপুর রাত্তিরে···"

বলল, দক্ষিণপাড়ার রূপচাঁদ মাইতির বাড়ি থেকে আসছে, পাঁঠাটাকে বলি দিতে হবে।

একবার মনে হ'ল খাঁড়াটা বের করে দিই ঝামেলা মিটিয়ে। কিন্তু অন্যায় হয়ে যায় ত। দিনের বেলা যা হচ্ছে তা ত হচ্ছেই, কি আর করা যাবে? এ একেবারে সমস্ত দিনের পুজো সারা হয়ে যাওয়ার পর মা এখন শয়নে, মন্তর না বললেও একটা ব্যাঘাত হবেই ত; কি করে সাহস করা যায়?

আজকাল এমনই ভয় হয়, তারওপর দল বেঁধে এসেছে বুঝিয়েই কথাটা বললাম।

ওরই মধ্যে বেশি রোগা গোছের একজন সামনে এগিয়ে এল, বললে—"আপনি যে হাসালেন পণ্ডিতমশাই, মা খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোচ্ছেন এসব কথা আর এ যুগে চলে ?"

পুজো-পদ্ধতিটা একটু বোঝাবার চেষ্টা করলাম। এমনি ত মা খানও না, নিদ্রাও যান না, তবে, আমাদেরই মনগড়া একটা মেনে নিয়ে ত করতে হয় তাঁর সেবা-আরাধনা ; সেটা ভেঙে দেওয়া কি উচিত হয় ?

বললে—"তেমনি আর একটা মন-গড়া কথা মেনে নিলেই ত নিশ্চিন্দি মশাই,—মায়ের এতগুলি ছেলে ধর্না দিচ্ছে, তিনি কি রে তোরা চাস কি বলে ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।"

একজন জোগান দিলে—"আপনি মানুষ হয়ে বেরিয়ে এলেন, আর তিনি ত মা-ই, সোজা মা নয়, বিশ্বজননী।"

কি ঠাট্টা করতে কি করে বসবে, ওদিকে যেতে আর প্রবৃত্তি হল না—। একটু হেসেই বললাম—"না হয় ছেলেরাই মায়ের কথা ভাবলে একটু।"

অন্য একজন বললে—"এ একটা ন্যায্য কথা বলেছেন। ছিলও উচিত, তবে বড় ঠ্যাকায় পড়েছি যে পুরুতমশাই। মা কি সেটা টের পাচ্ছেন না ?"

"ঠ্যাকাটা-কি ?"

বললে—"জামাইবাবু এসেছেন।"

খবরটার গুরুত্বটুকু উপলব্ধি করতে পারলাম কিনা দেখবার জন্যে পাঁচ জোড়া চোখ তুলে সবাই মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বললাম—"ভালো কথাই। কিন্তু ফীষ্ট সে ত দিনের বেলায় ; কাল সকালে এসেই বলি দিয়ে নিয়ে গেলে হবে।"

বিরক্ত হয়ে উঠেছে। সেই রোগা ছেলেটা বলল—"কত আর তর্ক করবি ওঁর সঙ্গে, ব্যাপারটা কি সব বলে দে না, এতদিন ধরে পুরুতগিরি করছেন, এটুকু আর বুঝতে পারবেন না ?"

নিজেই বলে গেল সবটুকু।

কেরানী জামাই নয় পথে-ঘাটে যা আথছার দেখা যাচ্ছে, জামাই ষষ্ঠীর দিন রাস্তায় একটা লাঠি চালালে যার পাঁচটা এক সঙ্গে গড়িয়ে পড়ে। মিলিটারি

জামাই—কাশ্মীর, বাঙ্গালোর, মীরাট, সেকেন্দ্রাবাদ—কত জায়গায় ঘুরে দু'দিনের জন্যে এসেছে, কেল্লায় রয়েছে, ভোর চারটের সময় আবার রওয়ানা দল নিয়ে, কোথায় তা কেউ বলতে পারে না—মিলিটারি কাণ্ড কারখানা ত। অনেক চেষ্টা করে ঘণ্টা চারেকের ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি এসেছে, তার এক মিনিট এদিক ওদিক হলে কোর্ট মার্শেল, না, কি একটা বললে। এসেছেও যে জামাই সেটা শ্বশুরবাড়ির টানে বা অন্য কিছুর জন্যে নয়, পাঁঠা খেতেই আনানো হয়েছে তাকে। মিলিটারিতে প্রাণটি হাতে ক'রে কাজ করা তো, বিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর শাশুড়ী মানৎ করে রেখেছিলেন পাঁঠাটা। তা দু'বছর ত জামাইয়ের দেখা সাক্ষাৎ নেই, কোথায় পুণা, কোথায় বাঙ্গালোর, কোথায় কাশ্মীর—ঘুরে বেড়াচ্ছে, অপেক্ষা করে করে পাঁঠাটা বোকা বনে গেল। ও পাঁঠা এখন মা-কালি ভিন্ন কেউ বরদাস্তও ত করতে পারবে না।

নিরুপায়, তবু একবার শেষ চেষ্টা করলাম, বললাম—"তোমাদের কথাই ধ'রে বলি, যখন মা ভিন্ন কেউ বরদাস্ত করতে পারবে না ও বোটকা গন্ধ, তখন তোমাদের জামাইবাবুও ত বাদ পড়ে যাচ্ছেন, তা'হলে বলিটা···।"

শেষ করতে দিলে না, এক পা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—"পেঁয়াজ-রসুন কি করতে রয়েছে মশাই? শালা বোকাকে টিট করে দোব না! নিন, আপনার কাজ আপনি ত ক'রে দিন।"

অগত্যা আব করি কি? বের করে দিলাম খাঁড়াটা।

তারপর, যা তোমায় বলছিলাম—তোমরা বলবে নিজের মনেই অনাচারটার জন্যে যে ভয়, যে দুশ্চিন্তা, যে মনোকষ্ট এসে জড়ো হয়েছিল সেইগুলোই একটা রূপ ধরে ঐ বকমটা হ'ল। হতেও পাবে, কতটুকুই বা আমরা জানতে পাই মা চৈতন্যরূপিণী কি রূপ ধরে কি খেলা খেলছেন, তবে বংশপরম্পরায় যা বিশ্বাস করে আসছি—আমার ত মনে হ'ল মায়েরই প্রত্যাদেশ।

সেই বাত্তিরেই। ঘুম ত আসতে চায় না, তারপর কখন একটু আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি—এলোমেলো নানারকম স্বপ্ন, তারপর মনে হ'ল মা যেন শিয়রের কাছটিতে এসে দাঁড়ালেন। প্রথমে তো চিনতেই পারি না। মুখটা গেছে শুকিয়ে, অমন চুল—ফুলে ফেঁপে ঘেঁটে গিয়ে যেন একশা হয়ে গেছে, অমন যে চোখের জ্যোতি, একেবারে যেন নিবে গেছে; যেন কতদিন ঘুমোন নি মা, টানা টানা দুটি চোখ যেন রাজ্যের ঘুমে এলিয়ে আসছে।

২

কাতর হয়ে বলছেন—"বাবা নকুলেশ্বর। আর পাঁঠা খাওয়ার শখ নেই, বলিটা উঠিয়ে দে তুই। সব ভুয়ো-বলি, মন্তর নেই, খেতেও ত পাই না, সে ত চেহারা দেখেই টের পাচ্ছিস, একটু যে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোব তারও উপায় রাখলে না এরা।"

বললাম—"তা যেন বন্ধ করলাম মা, আমারও এ অনাচার আর সহ্য হচ্ছে না, কিন্তু এরা সবই দেবে কেন বন্ধ করতে? কত বড় একটা সুবিধে।"

একটু ভাবলেন যেন মা, তারপর বললেন—"হয়েছে। তুই এক কাজ কর। শেঠ মংনিরাম খুব একটা বড় দাঁও মেরে চারিদিকে মহাবীরের প্রতিষ্ঠা করে দিচ্ছে। রামানুচর, সে ত আমারই অংশ, শুধু খাওয়ার ব্যাপারেই যা একটু প্রভেদ আছে, তা ওটুকু আমি···"

ছ্যাঁৎ ক'রে ঘুমটা ভেঙে গেল।

তোমরা বোধ হয় বলবে মংনিরামের কথাটা আসলে আমিই ভাবছিলাম, মন্দিরটা ক'বছর থেকে মেরামৎ হচ্ছে না, এদিকে একটা লোক ধর্মের নামে অমন দাতব্য করে যাচ্ছে চারিদিকে; মনে হবারই কথা ত। অস্বীকার করব না, দু' একবার হয়েও ছিল মনে। স্বপ্নটা পেতে একটু দোমনাও হয়ে পড়েছিলাম, তা'হলে না হয় পাড়ব একবার কথাটা!—মা কিন্তু আর দ্বারস্থ হতে দিলেন না, নিজেই ব্যবস্থাটুকু করে দিলেন।

ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকে, মন্দিরে লোক আসেনি। পুজো সেরে মন্দিরে চাবি দিয়ে ভেতরে যাব, একটি ছাতা মাথায় দিয়ে মংনিরাম এসে উপস্থিত। মনের অবস্থাটা আন্দাজ করতেই পার, জিগ্যেস করলাম—"কি খবর শেঠজী? হঠাৎ এ দুর্যোগে?"

বললে—"এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম মাঈকে একটা প্রণাম করে যাই; দুর্যোগ সুযোগ সব ত ওঁরই হাতে।"

দোরটা খুলে দিলাম, প্রণাম করে উঠলে হাতে মার চরণামৃত দিলাম। ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে মুখে দিয়ে একবার চারদিকটায় দেখে নিয়ে বললে—"আহা মায়ের অপার করুণা; কিন্তু নিজের এরকম দশা করে রেখেছেন কেন বাড়মচারী বাবা?"

বললাম—"আপনি ভক্ত শেঠজী, ওটা ত বুঝতেই পারেন। বিশ্বের মা, ওঁর কি নিজের দিকে চাইলে চলে। সে দেখবে ওঁর ছেলেরা, ওঁর সেবকেরা; তা এ সেবকের অবস্থা ত দেখছেনই মা।"

মুখটা একটু নামিয়ে নিয়ে মাথা চুলকাতে লাগল; 'তারপর আস্তে আস্তে তুললে কথাটা।...তারপর যা হ'ল, শুনেছই, দেখছও চোখে।

বিশ্বাস, নিশ্চিন্ততা, তার সঙ্গে বোধ হয় কোথায় একটু যেন দুঃখও,—একটু অদ্ভুতভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন পুরুত্তমশাই। আমার দৃষ্টিতে নিশ্চয় তখনও শেষ প্রশ্নটা লেগে রয়েছে, বোধ হয় লক্ষ্য করেই একটু সচকিত হয়ে বললেন—

"ও! হ্যাঁ, তুলেছিলাম বৈকি কথাটা, তা সে সমস্যাটা শেঠজী নিজেই মীমাংসা করে দিলে, বললে—'মাঈ ওটা নিজেই ছেড়ে দেবেন, দেখবেন আপনি বহ্মচারী বাবা। আবে বজ্‌রংবলী মহাবীরজীও ত ওঁরই সন্তান; ছেলে চালকলা খেয়েই দিন গুজরান করছে আর আমি মা হয়ে তার সামনেই পাঁঠা খেয়ে যাচ্ছি—একটা চক্ষুলজ্জা ত আছে।"

গ্রাম্য

বৃষ্টি এখনও নামেনি। আকাশের যেরকম অবস্থা, যখন নামবে, সৃষ্টি ভাসিয়ে দেবে একেবারে।

সকাল থেকে যে ইলশে-গুঁড়ি আরম্ভ হয়েছে, সেই ভাবটা চলছে এখনও। চারিদিক ঝাপসা। সত্যিই মনে হয়, মেঘ যেন গুঁড়ো হয়ে আকাশ থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে; খুদে খুদে জলের কণা এক-একবার হাওয়ার ঝাপটায় তোড়ের উপর এসে পড়ছে গায়ে, পুরোপুরি ভিজিয়ে না দিলেও জামাকাপড় স্যাঁতসেঁতে করে দিচ্ছে।

কিনারা থেকে প্রায় তের-চোদ্দ হাত ভিতর পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে মাচাটা বাঁধা হয়েছে। যারা মাছ ধরে, ছাতা মাথায় দিয়েই ধরে। তবে নায়েব মশাইয়ের ছেলের শখ, মাচার শেষ দিকটায় একটা ছোট্ট চালা তুলে দেওয়া হয়েছে। নায়েব মশাইয়ের ছেলে হরিবিলাস হুইলের ছিপ পেতে মাছ ধরছে।

মনটা কিন্তু মাছের দিকে পড়ে আছে বলে বোধ হয় না। ইলশে-গুঁড়ির কুয়াশায় চারিদিক মুছে একাকার করে দিয়েছে, পিছন দিকে কাছারি-বাড়ির একটা সাদা আবছায়া, কুয়াশাটাই যেন জমাট হয়ে উঠেছে; সামনে বিলটা হাত কয়েক পরেই নিশ্চিহ্ন, তবু হরিবিলাসের চোখ দুটো যেন ঘুরে ঘুরে কাকে খুঁজছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ চাক হতে ছিপে এক একটা করে টান দিচ্ছে বটে, মাছ কিন্তু তখন টোপ মুখে করে বিলের একেবারে মাঝামাঝি।

অবশেষে মাচাটা একটু দুলে উঠল, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দও উঠল গোড়ার দিকে; ফাতনাটা বার কতক গোঁত্তা দিয়ে আবার ভেসে উঠেছে। ক'ষে টান মারবার মোকা একটা। হরিবিলাস কিন্তু সেদিকে খেয়াল না করে ঘুরে চাইল পিছনে, প্রশ্ন করল, "রাখাল নাকি? এত দেরি হ'ল যে?"

মাচার উপর সাবধানে পা ফেলে ফেলে রাখাল চালাটার নীচে এসে পাশটিতে বসল। বলল, "হয়ে গেল একটু দেরি। বাদুলে মেঘ, শরীরটা আবার একটু খ্যাঁতখ্যাঁত করছে বলছিল। বলে, দাদা, তুমি একটু বস কাছটিতে।"

হরিবিলাস ব্যস্ত হয়ে উঠল। প্রশ্ন করল, "খ্যাঁতখ্যাঁত করছে মানে? জ্বরটর হয় নি ত?"

রাখাল বলল, "না জ্বর নয়। একটু নোনা ধাত ত, বার্ষে লাগলে কেমন যেন একটু এলিয়ে পড়ে ছেলেবেলা থেকেই।"

"এলিয়ে পড়ে, তা চিকিৎসা হয় না কিছু? তোমার দেখছি এসব দিকে বেশ একটু গাফিল আছ।"

"চিকিৎসা আছে, করাও হয় তাই। তা সে ত ওষুধপত্র নয়। একটু গরগরে করে ঝাল মশলা দিয়ে খানকতক মাছের দাগা, কিম্বা গরম গরম মাংসের সুরুয়া একটু; সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা করে দেয়; নোনা ধাত কিনা। তা মাছ ত দেখছি আপনি গাঁথতে পারেননি একটাও।"

হরিবিলাস ছিপটা টেনে তুলল। বঁড়শি তিনটেই পরিষ্কার। টোপ পরাতে পরাতে বলল, "খাচ্ছে কৈ তেমন জুত করে?"

রাখাল একটু বোকার মত হেসে বলল, "এর চেয়ে আর কত জুত করে খাবে? আসলে টের পেয়েছে শহুরে মানুষ, ওরা টানেই টের পায় কিনা। পড়ত আমার হাতে—"

হরিবিলাসও একটু হাসল; বলল, "ঠাট্টা হচ্ছে?" যেন উপভোগ করছে এইভাবে বলল, "বেশ, হক।" তারপরেই আবার একটু বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল; বলল, "কিন্তু কখন তোমার হাতের টান বুঝে মাছ আত্মসমর্পণ করবে তার ভরসায় থাকলে চলবে? বর্ষার ভাবটা ত এদিকে বেড়েই যাচ্ছে।···আমি বলছিলাম মাংসেব ব্যবস্থাই না হয় করলে হ'ত না একটু?"

"একটা মানুষের জন্যে? পো'টাকও বোধ হয় টানতে পারবে না।"

"কেন, আর খাবার মানুষ নেই? এমন চমৎকার বাত্লে দিন, পাঁঠা বেটারা জন্মেছে কী করতে। হারাধন পাইককে ডেকে নিয়ে এস আমার ঘরে। একটা কচি দেখে কিনে নিয়ে আসুক গাঁ থেকে।"

হুইলে সুতো গোটাতে গোটাতে উঠে পড়ল।

গোড়ার দিক থেকে না বললে সবটুকু পরিষ্কার হবে না। একটু বিশদ করেই বলা ভাল তা'হলে।

এক একটা পরীক্ষা দিয়ে ওঠার পর ছেলেরা সময় নিয়ে প্রথমটা যেন একটা সমস্যায় পড়ে যায়। একেবারে অতটা আত্মনিরোধের পর অতখানি মুক্তি, যেন

থৈ পেয়ে ওঠে না। তারপর আবার আস্তে আস্তে খাপ খাইয়ে নেয় নিজেকে। লক্ষ্য করলে এরও বেশ একটি পদ্ধতি বাঁধা আছে বলে মনে হয়।

ম্যাট্রিক দেওয়ার পর ঝোঁকটা যায় ঘুরে-ফিরে বেড়ানোর দিকে। তার কারণ স্কুলের ঐ টানা কয়েকটা বছর ছেলেদের সবচেয়ে বেশি করে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়; সুযোগের অভাব, তার উপর বয়সটাও স্বাধীনতার পরিপন্থী, ম্যাট্রিকের দরজার বাইরে পা দিতেই দিকচক্রটা হঠাৎ যেন বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে, টানে হাতছানি দিয়ে।

ইণ্টারমিডিয়েটের পর এ-ভাবটা কমে আসে। কলেজের খানিকটা মুক্ত জীবনে অনেকখানি দেখেছে শুনেছে ছেলে; ঠিক ওরকম অজ্ঞ, আদেখ্‌লো ভাবটা নেই। খানিকটা গাম্ভীর্যও এসেছে জীবনে, মন একটা বিশেষ দিক ধরে এগুতে শিখেছে। সময়টা যে হাতে এল, সেটাকে কতকটা সুপরিকল্পিত ভাবেই কাজে লাগাতে পারছে। কোনও কাজের মত কাজে, কিংবা কোন শখের কাজেই, এমন কি ঘুরে ফিরে বেড়াতেও; শুধু সে-ঘোরাফেরার একটা অনির্দিষ্ট এলোমেলো ভাব নেই আর।

বি এ পরীক্ষা যখন দিয়ে উঠল, তখন একটা আমুল পরিবর্তন এসে গেছে জীবনে। এদিককার যা দেখার তা বেশ খানিকটা দেখে শুনে নিয়েছে; খানিকটা পুরনো হয়ে গেছে, তাই জীবনের এদিকটা অনেকখানি সুনির্দিষ্ট সুসংহত। এখন এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলেরা একটা একেবারেই নূতন পথে পা বাড়াবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। বয়সটাও ততদিনে হয়ে উঠেছে অনুকূল, মনে রং ধরতে আরম্ভ করেছে; বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পরের ঢালা অবসরটা ছেলেরা যতটা পারে রোমান্স দিয়ে ভরে দেওয়ার চেষ্টা করে।

হরিবিলাসও করবে বলে ঠিক করল। বাড়িতে চারিদিকের ভিড়ের মধ্যে রোমান্স চর্চা করতে যাওয়ায় পদে পদে প্রতিবন্ধক, হরিবিলাস অন্য পরিবেশ বেছে নিল। ওর বাবা মথুরানাথ জমিদারের নায়েব। সুদূর এক পাড়াগাঁয়ে জমিদারের কাছারি-বাড়ি। সেইখানেই থাকেন; একাই। হরিবিলাস লিখে দিল, পরীক্ষার পড়ার চাপে শরীরটা একটু ভেঙে পড়েছে, দিন কতক গিয়ে থাকতে চায়। মথুরানাথ খুশীই হলেন। এর আগে একবার নিয়ে এসেছিলেন ছেলেকে, সেই স্কুলের যুগে, তারপর এতদিন ধরে আর আতঙ্কটা কাটাতে পারেননি। চিঠি পেয়ে স্টেশনে একটা হাতি পাঠিয়ে দিলেন, হরিবিলাস এসে উপস্থিত হ'ল।

গ্রাম্য

স্কুলের যুগের মনটা যখন অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত, তখন জায়গাটা যতই মন্দ মনে হ'ক, হরিবিলাস দেখল মনের এই পরিবর্তিত অবস্থায় বাছাইটা তার বেশ ভালই হয়েছে। শ্রীপুরের একদিক দিয়ে ইছামতী নদী। একটা বড় বাঁকের পাশে, নদী থেকে একটু সরে একটা খুব বড় বিল। নদীরই পুরনো খাত। তারই ধারে কাছারি-বাড়িটা। কাছারি থেকে বেশ খানিকটা সরে শ্রীপুর গ্রাম, পাশে বিল, সামনে নদী। সুবিধামত দুটোই ব্যবহার করে গাঁয়ের লোকে, যার যেটা কাছে হয়। কেউ স্নান করে, কেউ জল ভরে নিয়ে যায়, ছেলেরা সাঁতার কাটে, রাখালেরা গোরুর পাল নামিয়ে দেয়, মাঝি জমায় খেয়ার পাড়ি। দুটি জলাশয়কে আশ্রয় করে ছোট্ট গ্রামটি সমস্ত দিন চঞ্চল হয়ে থাকে। পড়ার ভাবনা গিয়ে একটা যে নূতন চিন্তা মনে উঁকি মারছে সেটাকে পক্ষাবৃত করে পুষ্ট করে তুলবার বেশ চমৎকার একটি পরিবেশ।

এর উপর বিধিও হলেন অনুকূল। আসার দিন দুই পরেই এমন একটা ব্যাপার হ'ল, যাতে হরিবিলাসের আর নিছক চিন্তা নিয়েই কাটাতে হ'ল না, একটা নিরেট অবলম্বন পাওয়া গেল রোমান্সের।

কাছারি-বাড়ির উত্তর দিকের অংশটায় মথুরানাথের বাসা। এই অংশটার উত্তর দিকের বারান্দায় বসলে বিল, আর পাশে গ্রাম, তার সামনে ইছামতীর বাঁক এক নজরে বেশ খানিকটা দেখা যায়। তাই দেখছিল হরিবিলাস। বিকেল বেলা, রোদটা হলদে হয়ে এসেছে, তারই আভায় বোধ হয় মনের মতো কাউকে গ্রামের কোথাও বসিয়ে বা চলা-ফেরা করিয়ে কোন স্বপ্ন রচনা করছিল। এমন সময় দেখল, বিলের যেখানটা ঘাটের মত ব্যবহার করে গাঁয়ের লোকে, তার খানিকটা উপরে পাকুড় গাছের ভাঙা বাঁধানো চাতালটায় একটি বছর বার-তেরর মেয়ে এসে হাতের কলসীটা নীচে নামিয়ে বসল। একলাই। গাঁয়ের মেয়েরা আসেনি এখনও, একটি যুবতী যে জল নিতে নেমেছিল, ঘড়া ভরে নিয়ে কাঁকালে বসিয়ে ডাঙায় উঠল, পাকুড় গাছের সামনাসামনি এসে মেয়েটির দিকে ঘুরে কী বলল, কী একটা উত্তর হ'ল, তারপর আবার দুলতে দুলতে উঠে গ্রামের দিকে চলে গেল। এ-মেয়েটি বসেই রইল। নীচে থেকে খড়-কুটো কী একটা খুঁটে নিয়ে অলসভাবে দাঁতে কাটতে লাগল, আর গা দুলিয়ে দুলিয়ে চাতালে গোড়ালি দুটো ঠুকতে লাগল, মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে গ্রামের দিকে চেয়ে দেখছে।

কিছুক্ষণ গেল, তারপরেই হঠাৎ মেয়েটি চাতাল থেকে পিছলে নেমে পড়ে

কলসীটা দু'হাতে চেপে ধরে কতকটা যেন রোখের সঙ্গেই উপরের দিকে চেয়ে রইল। কারণটা সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল। একটি ছেলে তীরের ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হন্‌হন করে নেমে আসছে। ঢালু মুখে গতিবেগ আরও বেড়েছে। এসেই কলসীটা চেপে ধরল। একটু কাড়াকাড়ি পড়ে গেল কলসীটা নিয়ে। ছেলেটিই অবশ্য জিতল, বিলে নেমে কলসীটা ভরে নিয়ে ডান হাতে কানাটা ধরে উপরে উঠে গেল। তারপর অদৃশ্যও হয়ে গেল। বেশ খানিকটা দূরে; মনে হ'ল পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মেয়েটা মুখ ঘুরিয়ে ভেংচি কাটল, তারপর হেলতে-দুলতে ভারী চালে যেন মুখটা গোঁজ করেই উঠে গেল।

সেদিন যতক্ষণ পর্যন্ত সন্ধ্যার আলো একটুও আকাশে লেগে রইল, হরিবিলাস একভাবে এক জায়গায় রইল বসে। এক কলসী জলেই একটা গৃহস্থের প্রয়োজন মিটে যায় কখনও?

বিলের তীর যখন অন্ধকারে মিশে গেছে, গ্রামের শেষ কলসীটি হয়ে গেছে ভরা, তখন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল হরিবিলাস।

দীর্ঘনিঃশ্বাস এই জন্য যে, এক কলসীতেই মিটে গেছে গৃহস্থের প্রয়োজন, নয় ত যার সন্ধানে এত কষ্ট করে আসা শ্রীপুরে, তাকে ত পেয়েই গেছে হরিবিলাস।

ছেলেটিকে চেনে। আলাপ নেই। তবে দু'দিন যে এসেছে, দু'দিনই সকালে কাছারি-বাড়িতে দেখেছে। তার পরদিনও দেখল। একটা কৌতূহল জেগেছে বলে বেশ ভাল ভাবেই দেখল লক্ষ্য করে। ছেলেটির বয়স বছর পনরো-ষোল হবে। হরিবিলাসের ঠিক সমবয়সী বলা যায় না, তবে খুব বেশী ছোটও নয় ওর চেয়ে। বেশ সুশ্রী; পাড়াগেঁয়ে ছেলের একটা অবহেলার ভাব আছে দেহে—পরিচ্ছদে, তবে তার মধ্যে দিয়েও রংটা যেন আভা দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে। গায়ে একটা আধময়লা মোটা তাঁতের কাপড়ের কুর্তা, তার নীচের দিকে একটা ময়লা পৈতের খানিকটা বেরিয়ে থাকতে দেখে হরিবিলাস বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল।

ছেলেটি গাঁয়ের দিক থেকে বিলের ধারে ধারে এসে কাছারি-বাড়ির দিকে চলে গেল। হরিবিলাস উপরের বারান্দা থেকে দেখছিল। কখন আবার বেরয়, তার প্রতীক্ষায় চুপ করে বসে রইল।

প্রায় ঘণ্টা দুই ঠায় বসে থাকতে হ'ল, তারপর কাছারি থেকে ছেলেটিকে বেরুতে দেখে হরিবিলাস আস্তে আস্তে নেমে এল।

নেমেও এল এমন আন্দাজ করে যাতে ছেলেটি একটু এগিয়ে যায়, তারপর পিছন থেকে ডাক দিল, "এই যে, শুনুন।"

ঘুরে দাঁড়াল ছেলেটি; প্রশ্ন করল, "আমায় ডাকছেন?"

হরিবিলাসের যেন ভুল ভাঙল একটা, বলল, "ও, আপনি?···না, আমি মনে করেছিলাম বুঝি ইয়ে—"

ছেলেটি একটু অপ্রতিভভাবে হেসে বলল, "না, আমার নাম রাখাল।"

যেন অন্যমনস্কভাবেই এগিয়ে গেল হরিবিলাস। বলল, "ও, আপনার নাম রাখাল? নতুন এসেছি কিনা, গোলমাল হয়ে যায়। নামেও গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। নাম, পদবী। শহরের দিকে একটু অন্যরকম ত।"

যেন অন্যমনস্ক হয়ে পায়চারি করতে করতেই এগলো। ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়েছিল, সেও পা বাড়াল। বলল, "পদবী ত একই, নামগুলোই যা সেকেলে। রাখাল নামটা দেখুন না, আজকের?"

একটু বোকার মত হাসল। হরিবিলাসও নেহাত অজ্ঞের মতই প্রশ্ন করল, "পদবী সব শহরের মতনই বুঝি?···আপনি ত দেখছি ব্রাহ্মণ।"

"হ্যাঁ, আমাদের পদবী চাটুজ্যে।"

"তাই নাকি!" খুবই আশ্চর্য হয়ে ঘুরে চাইল হরিবিলাস। বলল, "ওদিককারই মতন দেখছি ত। আমরা হচ্ছি বাঁড়ুজ্যে।"

"জানি। তাই ত বলছিলাম, পদবী সব এক।···তা, আমায় 'আপনি' বলছেন কেন? কত ছোট আপনার চেয়ে···"

হরিবিলাস একটু হাসল। বলল, "তা বলতে পার। ওটা একটা শহুরে অব্যেস। তোমার বাড়ি এই গ্রামেই নাকি?"

"হ্যাঁ, এই ত বিলের পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে গিয়ে···বিলের উপরই···ঐ যে জোড়া নারকোল গাছ দেখা যাচ্ছে—"

"ও! ঐখেনটায়?···তা'হলে কালকে বিকেল বেলায় যে মনে হচ্ছিল তোমারই মতন কে একটি ছেলে"···

ছেলেটি হঠাৎ লজ্জিত হয়ে গিয়ে ওর মুখের দিকে চোখ তুলেই ঘাড়টা আবার নিচু করল।

আর ওকথা নিয়ে না এগুনোই উচিত; কিন্তু আর লোভ কি ছাড়া যায়? হরিবিলাস প্রশ্ন করল, "তুমিই ছিলে তা'হলে?"

তারপর সামান্য একটু বিরতি দিয়ে বলল, "আর যেন মনে হ'ল একটি মেয়েও। অনেকখানি দূর থেকে দেখা ত, মনে হ'ল সাত-আট বছরের একটি মেয়ে যেন।"

কলসী কাড়াকাড়ির কথাটা আর তুলল না। বলল, "আমি যখন দেখলাম— বই পড়তে পড়তে একটু বাইরে বেরিয়ে এসেছি—দেখলাম তুমি কলসীটা হাতে ঝুলিয়ে ওপরে উঠছ। একটি যেন সাত-আট বছরের মেয়ে তোমার পেছনে পেছনে যাচ্ছে।···বোন নিশ্চয় ?"

ছেলেটি যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে শুনছিল, অপ্রতিভ ভাবটা একটু লেগে থাকলেও কলসী কাড়াকাড়ির দিকটা বাদ পড়ায় বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই একটু হেসে মাথা দুলিয়ে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

তারপর একটা যেন কী ভেবে নিয়ে বলল, "অত ছোট কোথায় ?"

"তা হবে। দূর থেকে দেখা ত। তার ওপর নজরও যায় না বেশী দূর, এই দেখ না চশমা নিতে হয়েছে। ভাই বোনে বুঝি পিঠোপিঠি ?"

রাখাল আবার একটু হেসে ঘাড় নাড়ল।

"তাই দেখছিলাম···"

পিঠোপিঠি ভাই-বোনের কলসী কাড়াকাড়ির মধুর দৃশ্যটির কথা বলে ফেলতে যাচ্ছিল হরিবিলাস; হঠাৎ সংবিৎ হ'ল, আরও লজ্জায় পড়ে যাবে। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "তোমাদের বাবা আছেন নিশ্চয়।"

রাখাল ঘাড়টা বেঁকিয়ে জানাল, আছেন।

"কী করেন ?"

"পণ্ডিত। বাড়িতেই লোয়ার প্রাইমারি পাঠশালা আছে।"

"বাঃ, তাহলে বিদ্যেচর্চা নিয়েই থাকেন। ছেলেমেয়ে সবাই পড়ে নিশ্চয় এক সঙ্গে ?"

রাখাল মাথা দুলিয়ে জানাল, হ্যাঁ।

একটু সময় নিতে হ'ল হরিবিলাসকে, তারপর প্রশ্ন করল, "বাড়ির ছেলে-মেয়েরাও ত পড়ে ?"

"আমি আর পড়ি না। পড়তাম আগে।"

হরিবিলাসের একটু ঠাট্টা করবার লোভ হ'ল। বলল, "তুমি ত লায়েক হয়ে গেছ।···ইয়ে···তোমার বোন পড়ে ত ?"

"ও ত পড়ায়···প্রথম দ্বিতীয় ভাগের ছেলেমেয়েদের।"

বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই কথাটা বলে রাখাল দৃষ্টিটা নত করল।

ঠাট্টার মধ্যে আরও একজনকে টেনে আনবার লোভটা সংবরণ করতে পারল না হরিবিলাস; বেশ একটু শিউরে উঠেই বলল, "আরে, বিদুষী যে একেবারে!… তারপর? ঘরের কাজও ত সামলাতে হয় একটু একটু?"

"মা দেন না বেশী করতে। ছেলেমানুষই ত? শরীরও খুব ভাল নয়, ভোগে মাঝে মাঝে।"

অনেক কথা আছে, অথচ যেন হাতড়ে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার একটু ভাবল হরিবিলাস, তারপর মনে পড়ে গেল ভাল কথাই। একটু আমতা আমতা করে প্রশ্ন করল, "ছেলেমানুষ…হ্যাঁ, ছেলেমানুষই বৈকি…তা এদিকে ত পেকে গেছে…মাষ্টারি করছে…ছেলেমানুষের মতন খেলার দিকে ঝোঁক-টোক আছে, না, তাও শেষ হয়ে গেছে?…খেলনা-টেলনার শখ? মানে, একেবারে বুড়িয়ে যাওয়া ত ভাল নয় এই বয়সে?"

"পুতুল-টুতুল খেলে। নিজেই গড়ে নেয়।"

"তাদের বিয়ে-টিয়েও দেয় ত? দাদার নেমন্তন্ন হয়?"

আবার হেসে একটু ঠাট্টা। রাখাল হাসল। হঠাৎ কেমন নিজের কাছেই একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল হরিবিলাস। ও-প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিল। প্রশ্ন করল, "তা হ্যাঁ, ইয়ে, বোন ত গুরুমশাইগিরি করে, তুমি নিজে কী কর? কাছারি-বাড়িতে রোজ কী করতে আস? কাজ-টাজ কিছু যদি চাও ত বাবাকে না হয় বলে দেখি। বামুনের ছেলে…"

রাখাল মাথাটা একটু নিচু করে নিয়ে বলল, "কাজই শিখতে আসি।"

"বাঃ! তবে ত ভালই। কার কাছে কেউ আত্মীয় আছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কে?…কাকা?"

রাখাল মাথাটা নিচু করেই বলল, "হ্যাঁ।"

"বাঃ, বেশ! কী কাজ করেন তিনি?"

"খাজাঞ্চি।"

"ভাল কাজ। শেখ। আমি বাবাকেও বলে দোব। বেশ ত?"

রাখাল লজ্জিতভাবে ঘাড়টা নাড়ল। তারপর ঘাড়টা তুলে একটু চকিত হয়েই বলল, "এসে গেলাম বাড়ি। আসুন না, আসবেন?"

হরিবিলাসও চকিত হয়ে উঠল। বলল, "না, না, আসব'খন। আসব না কেন? তবে আজ আর নয়, একটা হাতের কাজ ফেলে এসেছি।"

বেশ হঠাৎই ঘুরে পা বাড়াল, তারপর আবার ফিরে ডাকল, "শোন।"

রাখাল এগিয়ে আসতে বলল, "কথা হচ্ছে…ইয়ে, সেই ছেলেটি, যাকে তুমি ভেবে ভুল করছিলাম, তোমাদের পাড়াগেঁয়ে নাম আমার মনে থাকে না বাপু, তা সে ক'দিন থেকে না আসতে বড় একলা পড়ে গেছি। তুমি না হয় আসবে, যে-ক'টা দিন আছি। সঙ্গী পাই তা'হলে। খাজাঞ্চিবাবুকে তা'হলে বলে দেব।…আরে কাজ ত পালাচ্ছে না।"

রাখাল হেসে ঘাড় কাত করল।

খাজাঞ্চিবাবু নিজেই কথাটা পাড়লেন তার পরদিন।—"রাখাল বলছিল, বড় একলা পড়ে গেছেন, চান যে একটু কাছে কাছে থাকে! তা থাকবে, তার হয়েছে কি? এমন ভাল সঙ্গ…"

নায়েবের ছেলে, বেশ কৃতার্থ হয়েই বললেন।

হরিবিলাস বলল, "না, সকাল বেলাটা কাজ শিখুক যেমন শিখছে। বিশেষ করে আপনি যখন শেখাচ্ছেন। বিকেলের দিকটা বড় একলা বোধ হয়; সেই সময়টা যদি আসে…"

ভবিষ্যৎ ভেবে কাকাকেও একটু হাতে রাখা দরকার ত।

মুখে একটু খাতির দেখালেও সকাল-বিকাল সর্বক্ষণই কাছে টেনে রাখল রাখালকে। ছেলেটি বেশ মিষ্টি। এদিকে কতকটা যেন হাঁদা গোছের, তাতে ওর বোনকে নিয়ে আলোচনা করতে বেশ যেন একটা আড়াল পাওয়া যায়, চক্ষুলজ্জাটা আসতে পায় না। আলোচনার মাত্রাটা বেশী হয়ে যাচ্ছে কিনা সেদিকে রাখালের হুঁশ নেই, নিজেই গায়ে প'ড়ে কখনও কখনও তোলে তার কথা। পাড়াগেঁয়ে ছেলে, ওর বোন ত সে যেন দুনিয়ার সবার বোন, শহুরে ভালবাসা বলে যে একটা আলাদা জিনিস আছে তার যেন কিছুই জানে না, বোঝে না।

হরিবিলাস সুযোগ বুঝে সূত্র ধরিয়েই রেখেছিল, খেলনা দিয়েই আরম্ভ করল। একটু ঘনিষ্ঠতা করতে দিন চারেক গেল, তারপর বেড়িয়ে আসার পর সন্ধ্যায় রাখালকে বাড়ি যেতে না দিয়ে নিজের ঘরেই নিয়ে গেল এবং ঘরটা ভেজিয়ে দিয়ে বাক্স খুলে বেশ কতকগুলি নানারকমের খেলনা বের করল। সেলুলয়েডের, রবারের, কাচের, প্ল্যাসটিকের, টিনের। নানারকমের পুতুল। পাখি, জানোয়ার,

চেয়ার টেবিল, পাল্‌কি—সব মিলিয়ে গোটা পনরো। রাখালের লুব্ধ বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, "কার জন্যে বল দিকিন ?"

চোখ দুটো বড় বড় করে রাখাল প্রশ্ন করল, "নবর জন্যে ?"

মেয়েটির নাম নবদুর্গা।

হরিবিলাস মাথা দোলাতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, "উঃ কী খুশী যে হবে! পুতুল এত ভালবাসে! এসব ত চোখেও দেখেনি, পাওয়া যায় না ত এখানে! উঃ, শুনলে কী ভালবাসবে সে আপনাকে!"

হরিবিলাস একটু শিউরেই উঠল।

"আমার নাম কখনও করে! খবরদার!"

তারপর সে-ভাবটা সামলে নিয়ে একটু হেসে বলল, "কী বোকা তুমি! নিজের নাম কববে। দাদা হচ্ছ···বাঃ!"

"হাতে পয়সা কোথায় ? আর অল্প ক'টি নয় ত।"

একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল হরিবিলাস। বলল, "তা বটে। অবিশ্যি এব পরে আমার নাম করতে পার, খেতি হবে না। তবে এখন···সত্য সত্য—"

একটু সচকিত হয়ে প্রশ্ন করল, "হয়েছে! তুমি কাজ শিখছ, মাইনে পাও না ?"

রাখাল সঙ্কুচিতভাবে বলল, "শিখছি ত মোটে···"

হবিবিলাস একটু রেগেই উঠল। বলল, "বাঃ, শিখছ, তা একটা হাতখরচ পাবে না? বড় বড় সব কোম্পানীতে অ্যাপ্রেন্‌টিস নিলেই একটা কবে অ্যালাউএন্স পায়। তোমবা চাইতেও জান না, পাও-ও না। শিখছ সে ওদের জন্যেই ত। আমি বাবাকে বলব; দিতেই হবে। বাঃ!"

দৃষ্টি উৎফুল্লই হয়ে উঠল রাখালের। কিন্তু সঙ্কুচিত হয়ে বলল, "কিন্তু সে কবে পাব···"

"শিগ্‌গিরই পাবে।"

"কিন্তু পাইনি ত এখনও···"

"তুমি একটু বোকা বাপু। হাতখরচ দেওয়ার কথা হচ্ছে, টের পেয়েছ, আহ্লাদ হয়েছে, ধার করেই বোনের জন্যে কিছু খেলনা আনিয়ে দিয়েছ। তাতে বরং আমারই নাম করতে পার, ধার দিয়েছি, আনিয়েও দিয়েছি খেলনা। তবে হ্যাঁ, তোমার বাবা-মা এখন কেউ জানবেন না! লুকিয়ে বের করবে, লুকিয়ে খেলবে।"

তারপর একটু টেনে টেনে যেন কী চিন্তা করে বলল, "পরে সে তখন যদি টের পান, তাতে খেতি হবে না।"

রোমান্স বেশ জমে উঠতে লাগল। এই পাড়াগাঁয়ের এত আনন্দ যে কোথায় ছিল হরিবিলাস বুঝে উঠতে পারে না। এর মাঠঘাট, বিল, নদী, এর যেখানে লোক নেই, সেখানে লোকের গাদাগাদি, সব যেন স্বপ্নময় বলে মনে হচ্ছে। এত মধু যে কোথায় লুকনো ছিল! রাখালকে আরও ভাল লাগছে। একদিন প্রসঙ্গক্রমে বললও, "তোমার নামটা পুরনো বলে তোমার অপছন্দ, কিন্তু আমার ত ভালই লাগে বেশ। ভাল বলেই না এত পুরনো হয়েও আজও চলে আসছে।… তা'হলে ত নবদুর্গাও পুরনো, তা বলে কম মিষ্টি?"

মাঠে পথে ঘুরে বেড়ায় রাখালকে নিয়ে, নদীর তীরে নির্জন দেখে বসে। সর্বদাই যে নবদুর্গার কথাই হচ্ছে এমন নয়, তবে অনেকক্ষণ ধরে বাদও থাকে না; বেশী দেরি হলে রাখালই তুলল প্রসঙ্গটা, এমনও হচ্ছে মাঝে মাঝে।

দেখলও বার দুই নবদুর্গাকে। দিবালোকে নয়। যার রোমান্সের একটুও জ্ঞান আছে সে দেখেও না অতি-স্পষ্ট দিবালোকে। বার চারেক বেড়িয়ে ফেরার পথে রাখালকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে বার দুই দেখে ফেলল। দেখে ফেলল, সন্ধ্যা যখন গাঢ় হয়ে এসেছে, সন্ধ্যার মতই ঘন কেশরাশি নবদুর্গার দেহখানিকে চারিদিক দিয়ে আচ্ছন্ন করে আস্তে আস্তে গেছে মিলিয়ে। একটি মুহূর্তের চকিত দেখা, কিন্তু সেই মুহূর্ত যা সমস্ত জীবন নিয়ে থাকে ছড়িয়ে।

"শরীর মাঝে মাঝে খারাপ হয়?…সে ত ভাল কথা নয়। একটা ভাল টনিক খাওয়াও, অবিশ্যি লুকিয়ে, পরে তখন টের পেলে ক্ষেতি হবে না।"

"টনিকের সঙ্গে ভাল খাবারেরও ত দরকার।" বোকার মত মুখটা একটু নিচু করে বলেই ফেলে রাখাল।…সে-ব্যবস্থাও হয়, অতি সহজেই। হরিবিলাসের পাড়াগাঁয়ে এসে স্বাস্থ্য ফিরেছে, বেশ ক্ষিধে হয়েছে। এখন প্রায় তিনটে হরিবিলাসের জলখাবার খায় সে। খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের লুচি, ছানাবড়া, সরভাজা রসকরা, রসবড়া যেদিন যেমন সখ হয়।

একটু চতুর হাসির সঙ্গে রাখালের সঙ্গে কথা হয়। হরিবিলাস বলে, "কেন, তুমি ত জলপানি পাচ্ছ এখন, বোনের জন্যে এটা-ওটা ফরমাস দিয়ে নিয়ে যেতে সাধ হয় না? যদি টের পায়ই কেউ, ত বলবার কী আছে? আমার নাম কর না ত? কেউ জানে না তো যে আমিই পাঠাচ্ছি?"

রাখাল বোকার মত হেসে বলে, "তা কখনও করি ?"

একদিন ঐ প্রশ্নের ঐ উত্তর দিতে হঠাৎ একটু বেশীরকম বোকার মত হেসে উঠল রাখাল। হরিবিলাস একটু বিমূঢ়ভাবেই প্রশ্ন করল, "হঠাৎ অত হাসি যে ?"

হাসতেই লাগল রাখাল। তারপর হরিবিলাস একটু ধমকের মত দিতে হেসেই বলল, "নাম না করলেও ওর কাছে লুকুনো থাকে নাকি ?"

"তার মানে !" বেশ বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করল হরিবিলাস।

"আমায় বোকা বলেন বলুন, কিন্তু দাদা বোকা হলে বোনকেও বোকা হতে হবে নাকি ? ধরে ফেলেছে।"

"কবে থেকে গো ? কী করে ?"

"ভয়ানক চালাক যে। ধরে ফেলেছে অনেকদিনই। সেই যেদিন খেলনাগুলো নিয়ে যাই সেইদিনই। আপনাকে বলিনি, রাগ করবেন আপনি।"

রাগ করবার কোন লক্ষণই না দেখিয়ে হরিবিলাস বলল, "তা রাগ করব বৈকি। বলতে হয় আমাকে। তা'হলে কি আর দিই কিছু ? কি বলে জিনিসগুলো পেয়ে ?"

"সে শুনলে আপনি আরও রাগ করবেন। ফরমাস করে কত—তা কি আপনাকে বলছি ? বলে, আমার দাদাব বন্ধু যখন, তখন তিনি আমারও দাদা, কেন দেবেন না ?"

বাগই কবল হরিবিলাস। কেন এতদিন বলেনি রাখাল ? যেমন টের পাওয়ার কথা বলা উচিত ছিল রাখালেব, তেমনি আবদার করে চাওয়ার কথাও বলা উচিত ছিল। ছেলেমানুষই ত বেচারী।

অনেক আবদারই করে রেখেছিল নবদুর্গা। সিল্কের রুমাল, এসেন্স, সাবান, খোঁপার শৌখিন ক্লিপ। দাদার যেমন পছন্দ। একে একে সব যোগান হতে লাগল।

তারপর লেখার খাতা, চিঠির প্যাড, ঝরনা-কলম…

রোমান্স যেন নিজের পথ করে ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগিয়ে চলেছে। হরি-বিলাস এত সৌভাগ্য কল্পনাও করতে পারেনি কখনও। জোগায়। বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করে, "এসব কী করবে ? বিদ্যে ত দ্বিতীয় ভাগ শিশুশিক্ষা পর্যন্ত।"

রাখাল আরও বিস্মিত করে তোলে, খোকার মত চতুর হাসি হেসে বলে, "নভেল কিনে দিতে বলেছে।…চেনেন না ত ওকে !"

একদিন নদীর তীরে অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে হরিবিলাস হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "নভেল পড়ে···পদ্যটদ্য বুঝতে পারে?"

রাখাল বলল, "জিজ্ঞেস করছিল সে-কথা। দাদা অত বিদ্বান, পদ্যটদ্য লেখেন না?"

লিখত না হরিবিলাস; ক'দিন থেকে আরম্ভ করেছে। নবদুর্গা শুনছে, ফরমাশ করে করে।

বোকা ভাই, অত বুঝছে না, বেশ একটা পর্দাও রয়েছে। বেশ কৌতুক লাগে হরিবিলাসের। মাঝখানে ভাইকে বসিয়ে দু'দিক থেকে দু'জনের লুকোচুরি খেলা চলছে।

ওদিকেও নজর আছে। হুইলের ছিপ নিয়ে ইলশে-শুঁড়ির মধ্যে বসে থাকে। রাখাল বলে, "নোনা ধাত ত, ঝাল-মশলা দিয়ে দুটো মাছের দাগা পেটে গেলে ঠিক হয়ে যাবে। কিম্বা একটু গরম গরম মাংসের সুরুয়া!" তাড়াতাড়ি সুরুয়ারই ব্যবস্থা হচ্ছে।

রোমান্সটাকে যতদুর সম্ভব ক্লাইম্যাক্সের কাছাকাছি এনে রেখে একদিন আবার শহরে ফিরে গেল। রাখাল বলল, "বড় মুশড়ে পড়বে নবদুর্গা।" আরও নানারকম মনভোলানো জিনিসপত্র দিয়ে গেল হরিবিলাস।

নিজেও কি কম মুশড়ে পড়েছে? আর বিলম্ব করল না। বাড়িতে জানিয়ে দিল, অমুক গ্রামে, অমুক পণ্ডিতের মেয়ে, এই নাম বিয়ে করতে হয় ত তাকেই বিয়ে করবে।

এতদিনে মত হয়েছে তার উপর পাশটাও করেছে সদ্য সদ্য, মা, পিসী, ভাজ সবাই উৎসাহ করে লিখে দিল হরিবিলাসের বাপকে। চিঠি এল, অমুক পণ্ডিতের কোন মেয়ে নেই ত। অমুক নাম সে তাঁর পুত্রবধূর, খাজাঞ্চি শ্রীনাথ বাঁড়ুজ্যের মেয়ে। হরিবিলাস বোধ হয় অন্য কারুর মেয়ের সঙ্গে গোলমাল করে ফেলে থাকবে। খোঁজ নিচ্ছেন তিনি।

পাড়াগাঁ সম্বন্ধে আতঙ্কটা আবার চতুর্গুণ হয়ে ফিরে এসেছে হরিবিলাসের।

সেখানে ভেড়ার চামড়া গায়ে দিয়ে রাখালের মত নেকড়ের দল ঘুরে বেড়ায়!!

'কালো বাজার'

অদ্ভুত একটা চঞ্চলতা পড়ে গেছে ছেলেমেয়েগুলোর ভেতর ; এই যারা আট-নয় বছরের মধ্যে। পাকা চুল তুলে দেওয়া, পায়ে হাত বুলানো, কি পিঠে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য যাদের ডাক পড়ে ; এই ক'রে যারা দু'পয়সা রোজগার করে।

দু'দিন পরে জ্যেঠামশাই আসছেন।

রোজগার কিছু কিছু প্রতিদিনই আছে অবশ্য, দাদু রয়েছেন, দিদিমণি রয়েছেন ; যাঁরা অত বড় নন, তাঁদেরও মাথায় খুঁজে-পেতে দেখলে পাওয়া যায় দু'চার গাছা ক'রে পাকা চুল ; তা ছাড়া পায়ে হাত বুলোন, পিঠে সুড়সুড়ি দেওয়া আছে, কিন্তু সে যা আয় তাতে জুত হয় না। ভাগ বসাবে অনেকগুলি। এদিকে দাদুর মাথায় একটা রুটির মত টাকই মাঝখানে। দিদিমণির পাকা চুল বেড়ে যাচ্ছে বলে টাকের ভয়ে কমই তোলান আজকাল। হাত বুলোন, সুড়সুড়ি দেওয়ার দিকেই ঝুঁকেছেন বেশী। ওতে পয়সা নেই তেমন। পাকা চুলের একটা হিসাব আছে—দাদু দেন বারোটায় এক পয়সা, দিদিমণি দেন ষোলটায়। আর সবাইও তাই ; হিসাবের জিনিস, গুণিয়ে দিলে এসে যায় দাম। সুড়সুড়ি কি পায়ে হাত বুলোনোয় মুশকিল হচ্ছে, কখন ঘুমিয়ে পড়েন, এতবার সুড়সুড়ি দিয়েছি, কি এতবার হাত বুলিয়েছি, সেটা চোখের সামনে ধ'রে দেওয়ার কিছু থাকে না। বাড়িয়েই বলতে হয় ; বাড়িয়ে বলছে মনে করে ওঁরা কমিয়েই হিসাব করেন। বিশেষ কিছু থাকে না হাতে। এ দুটোর রেট্‌ও কম ; দাদু, দিদিমণি, অন্য কেউ—সব কুড়িবারে এক পয়সা। আবার বেগার খাটাও আছে ; কেন না, "অন্য কেউ"-এর মধ্যে দাদারা আসে না। বলে—পুণ্যি উপার্জন করছিস, আবার পয়সা কি ? বরং বেশী ক'রে দে, দু'হাতে পুণ্যি লুটে যা।"

বাইরে থেকে কেউ এলে সে দেয় ভালো। পিসেমশাই, কি মামাদের কেউ, কি মেসোমশাই—এঁরা এলে সুবিধেই হয়, তবে কারুরই চুল পাকা নয়, সুড়সুড়ি কি হাত বুলোন থেকে যা পাওয়া যায়। তা পাওয়া যায় ভালই। অনেক দিন পরে পরে আসেন, কে পড়ায় ফাঁকি দিলে, কে কি দুষ্টুমি করে ফেললে, সে-সব দিকে নজর থাকে না ত, কাজেই দয়া-মায়া থাকে একটা। রেট্‌ও

ভাল দেন, তা ভিন্ন একটু যদি বাড়িয়েই বলা যায় ত মিছিমিছি মিথ্যেবাদী বলে কমিয়ে দেন না।

জ্যেঠামশাই এলেন একেবার অনেক দিন পরে। এমনি-সেমনি অনেক দিন নয়। আজমীঢ়ে থাকেন, সে অনেক দূর। এতদিন পরে এলেন যে টুনী, বাঁটুল দেখেই নি; হীরু দেখেছিল তবে মনে নেই; সে তখন মাত্র দেড় বছরের। মনে আছে শুধু রত্নার, তার বয়স তখন তিন বছর। জ্যেঠামশাই মানেই ত কাঁচা-পাকা চুল, কিন্তু তখন পাকা চুল তোলা হ'ত না। রত্নার মনে আছে কোলে করে নিয়ে খুব বেড়াতেন, খেলনা, বাঁশি কিনে দিতেন। এতদিন পরে এখন ত আরও ভাল ক'রে জ্যেঠামশাই হয়েছেন, পাকা-চুল আরও বেড়েছেই নিশ্চয়। যে অমনিই আদর করে খেলনা-বাঁশি কিনে দেয়, পাকা চুল তুলে দিলে, পায়ে হাত বুলোলে, পিঠে সুড়সুড়ি দিলে সে যে কত কিই না দেবে ওরা ভেবে পাচ্ছে না।...সে খোঁজও নিয়েছে ভাল করে সবার কাছে; না জ্যেঠামশাইয়ের টাক নেই মাথায়; একেবারেই নেই।

দুটো দিন যে কী করে কাটল ওদের তা শুধু ওরাই জানে। যতই জ্যেঠামশাইয়ের গল্প শোনে সবার কাছে, ততই ছটফটানি যায় বেড়ে, কবে আসবেন, কখন আসবেন। তারপর মাঝখান থেকে আর এক দুশ্চিন্তা, যেদিন আসবেন সেই দিন হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির—জ্যেঠামশাই প্রয়াগে নেমে একদিন কাটিয়ে আসবেন। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল—সর্বনাশ প্রয়াগ মানেই যে একেবারে মুড়োনো মাথা। দাদু এই ত সেবারে বড় পিসেমশাইয়ের সঙ্গে গিয়ে মুড়িয়ে এলেন, দু'জনেই। তারপর এই ত সেদিন সবাই গেল এক সঙ্গে—শুশুর ঠাকুরমা আর পিসীমা, হারানের মা আর জ্যেঠাইমা, সনাতনের বড়দিদি, ফটিকের খুড়িমা, ফিরে এল যেন এক ঝুড়ি বেল; একজনেরও মাথায় একগাছি চুল নেই। জ্যেঠামশাই আবার এমন সর্বনেশে জায়গায় নামতে গেলেন কেন? কি হবে, কি দেখতে হবে, যেন নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে আরও একটা দিন কাটাল সবাই। তার পরদিন সকালবেলায় জ্যেঠামশাই এসে উপস্থিত হ'লেন। বাঁচল সবাই। না, প্রয়াগের ফাঁড়া কাটিয়ে এসেছেন, এক মাথা চুল। একটু অসুবিধে, কিছু বোধ হয় বাদ যাবে, কানের কাছে আর ঘাড়ের কাছেরগুলো বড্ড ছোট; তাহলেও বাকি যা থাকে, তাতে বেশ দু'পয়সা আসবে সবার হাতে। তবে একটা মুশকিল হয়েছে; জ্যেঠামশাই যেন বড় কি রকম। বেশ মোটাসোটা,

কালো বাজার

মুখখানা টকটকে লাল আর এত বড়। কাছে যেতে যেন সাহসই হচ্ছে না। ভেবেছিল মামাদের বেলায় যেমন হয়, ডেকে নেন কাছে, তারও ত কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আর মুখে একটুও হাসি নেই। এসে বড় ঘরটায় বসে গল্প করছেন সবার সঙ্গে—দাদু, দিদিমণি, কাকা, দাদারা; এরা চারজন হাঁ করে রয়েছে কখন একটা হাসির কথা হবে, জ্যেঠামশাই হাসবেন একটু, তা যদিবা হ'ল দু'বার; সবাই হাসল, কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম, জ্যেঠামশাইয়ের মুখ কিন্তু সেই এক রকম। এ-জ্যেঠামশাইয়ের অত পাকা চুল তা'হলে আর কি কাজে লাগবে, কেউ ভেবে উঠতে পারছে না।

এমন সময় এক ব্যাপার হ'ল।

কাছে ত আসতে ভরসা হচ্ছে না। হীরু, টুনী, বাঁটুল, রত্না দূরে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল আর ভাবছিল কি করে কি হবে;—হীরু আর টুনী দোরগোড়ায়। বাঁটুল আর রত্না জানলার ধারে, জ্যেঠামশাই গল্প করতে করতে একবার ওদের দিকে চেয়ে দাদাদের বললেন—"তা ওরা ওরকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন বাইরে বাইরে? বৌমা ডেকে নিয়ে খাবার দিন না হাতে।"

সেজকাকা বললেন—"থামো, খাবারের ভাবনাই যেন বড় ওদের কাছে, ওরা এখন যা হিসেব নিয়ে পড়েছে।"

জ্যেঠামশাই হাঁ করে চেয়ে বললেন—"কিসের হিসেব?"

ছোটকাকা বললেন—"তুমি যে মস্ত বড় এক বেসাতি নিয়ে এসেছ মাথায় করে। দেখছ না, কি করে চেয়ে আছে সব। ওদের নাকি এখন খাবারের কথা ভাববার সময় আছে!"

জ্যেঠামশাই মাথায় হাত দিয়ে বললেন—"বেসতি কি এনেছি? পাঞ্জাবীদের মতন পাগড়ি বাঁধতে হয়, তাও ত সেখানেই রেখে এসেছি।"

ছোটকাকা বললেন—"অনেক চুল পাকিয়ে এসেছ যে, পাগড়ি বেঁধে বড়দা। কি রকম লাভের ব্যবসা টের পাওনি ত এখনও। বারোটা তুলে দিলে এক পয়সা। নেহাত দাঁড়িয়ে নেই চুপ করে কেউ, মাথার কোনখানটায় কি রকম মাল রয়েছে···"

অত গম্ভীর ত জ্যেঠামশাই, হঠাৎ এত জোরে হেসে উঠলেন যে, সবাই যেন চমকে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না, ওদিককার বাজে গল্প থেমে গেল। ওদের সবাইকে ডাকলেন। ততক্ষণে লজ্জায় পড়ে ওরা ত লুকিয়ে পড়েছে, দাদারা গিয়ে ধরে নিয়ে এল এক-এক করে।

কী চমৎকার যে জ্যেঠামশাই! প্রকাণ্ড কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে একসঙ্গে চারজনকেই আদর করতে লাগলেন।…"আমি কোনটিকে দেখে গিয়েছিলাম সেবার?…এইটিই ত সেই রত্না না?…কোলে কোলে থাকত।…হ্যাঁগো মা, তা তুমিই ত বুড়ী হয়ে গেছ, আমাকেই পাকা চুল তুলে দিতে হবে যে তোমার।" আবার সেই রকম করে হেসে ওঠেন।…"আর কাকে দেখে গিয়েছিলাম?"…

ছোটকাকা বলেন—"ঐ যে, হীরু, যখন গেলে তুমি তখন মাত্র দেড় বছরেরটি ত।"…হাত দিয়ে মাথাটা একটু ঠেলে ধ'রে জ্যেঠামশাই চোখ বড় বড় করে বললেন—"আরে, এই নাকি সেই হীরুবাবু?—দেড় বছরের থেকে এমন করে চুপি চুপি সাত বছরের হয়ে গেলে কি করে চিনব? আমি বেচারী ত এক বছরও বাড়তে পারি নি।"…আবার হেসে উঠে ছোটকাকার দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলেন—"পেরেছি বাড়তে?"…রত্না ত বড় হয়েছে, এত হাসি দেখে সাহসও গেছে বেড়ে, খুব চালাক হতে ইচ্ছে হয়ে বলে দিল—"মোটা ত হয়েছেন আপনি।"…সবাই একেবারে হো-হো করে হেসে উঠল। জ্যেঠামশাই ত মনে হ'ল যত হাসি পেটের মধ্যে এতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিলেন, সবগুলোকে একসঙ্গে ছেড়ে দিলেন। দিদিমণি কেউ কাউকে মোটা বললে রেগে যান, তার ওপব জ্যেঠামশাই তাঁর ছেলে, কিন্তু ধমক দিতে গিয়ে তিনিও একটু হেসে ফেললেন। টুনী-বাঁটুলেব কথাও জিগ্যেস করে ঐ রকম মজার কথা বলে বলে হাসলেন জ্যেঠামশাই, আরও সবাই হাসল, তারপর পকেট থেকে চারটে টাকা বের করে সবার হাতে একটা একটা করে দিয়ে বললেন—"এই নাও, আমি বাপু দাদন দিয়ে রাখছি, খেয়ে দেয়ে যেই গিয়ে বিছানায় শোব, সবাই আসবে পাকা চুল তুলতে, হাত বুলিয়ে দিতে। যাও, বৌমার কাছে খাবার রয়েছে, খাওগে।"

চমৎকার মানুষ জ্যেঠামশাই, এত আদর ওরা জন্মে আর কারুব কাছে পায় নি। আর, সব রেট্‌ও বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেক—পাকা চুল চারটে তুলতে পারলেই এক পয়সা, গায়ে সুড়সুড়ি আর পায়ে হাত বুলোন আটবারেই এক পয়সা। একদিনেই যে টাকাটা জ্যেঠামশাই দিয়েছিলেন সেটা শোধ হয়ে গেল। কত রাত জেগে এসেছেন, তার ওপর খুব ভাল বলে ওরা সবাই খুব যত্ন ক'রে সেবা করল, পাকা চুল তুলে দিল, একটুর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন, কিন্তু সত্যি এত ভাল যে ওরা যখন বলল এতবার করে হাত বুলিয়েছে, সুড়সুড়ি দিয়েছে, এতগুলি করে পাকা চুল তুলে দিয়েছে, একবারও তিনি দাদু, দিদিমণি কি কাকাদের মত

বললেন না যে, তোরা মোটে এতবার দিয়ে, এত বেশি করে বলছিস। ছোটদার কাছে ওরা সবাই হিসেবটা করিয়ে নিলে—এত পাকা চুল, এতবার করে সুড়সুড়ি, এতবার হাত বুলুনো, এত করে রেট্; একটাকা শোধ। জ্যেঠামশাই উঠলে ওরা সবাই দেখাল স্লেটটা, দেখে একটু হাসলেন, তারপর বললেন—"বেশ, আবার কাল দুপুরে।"

বেশ রোজগার হ'ত, তবে ছোটদা শত্রুতা করল। ছোটদা বলে ও হিসেব করে দেবে, তার জন্যে জনা-পিছু ওকে আট আনা করে দিতে হবে। ওরা চার আনা করে দিলে; নৈলে আর থাকে কি ওদের? ছোটদা জেঠামশাইকে বলে দিলে—দাদু, দিদিমণি কাকারা সবাই পাকা চুল গুণিয়ে নেন; সুড়সুড়ি, হাত বুলোন যতবার বলবে তার থেকে দশটায় পাঁচটা করে বাদ দেন—এই বাড়ির নিয়ম; জ্যেঠামশাইও যেন তাই করেন, নৈলে ওরা বড্ড ফাঁকিবাজ, দু'দিনে পকেট খালি করে ছেড়ে দেবে। জ্যেঠামশাই ত সব তাতেই আজকাল হাসেন ঐ রকম করে; বলেছেন—আচ্ছা, সে দেখা যাবে। ওরা আর ছোটদার কাছে হিসেব করাবে না, সেজবৌদি চার আনাতেই রাজী হয়েছে, তার কাছেই করিয়ে নেবে।

সুড়সুড়ি আর হাত বুলোনতেই বেশী পয়সা, সবার ইচ্ছে ঐদিকেই থাকে; কিন্তু মুশকিল হয়েছে অত পা আর অত গা কোথায় জ্যেঠামশাইয়ের? তাই ঠিক হয়েছে দু'জন দু'জন করে থাকবে দু'দিকে। এ দু'জনের পাকা চুলের পালা শেষ হলে, গায়ের দিকে, পায়ের দিকে চলে যাবে; ও দু'জন আসবে চুলের দিকে।

চুলের দিকে আর একটা মুশকিল যে, মাথায় অত পাগড়ি বেঁধেও জ্যেঠামশাই খুব বেশি চুল পাকাতে পারেন নি। তা ভিন্ন দাদুর মত এক রকমের বড় বড় চুলও ত নয়,—কানের কাছে, ঘাড়ের কাছে এত ছোট যে, ধরতেই পারা যায় না ভাল ক'রে। অথচ উপায়ও ত নেই; অমন করে পালা বেঁধে দেওয়া হ'ল, তুলতেই হবে। চুলের দিকটা নিয়ে সবাইকে যেন একটু মনমরা করে দিয়েছে। ভাবছে সবাই।

আরও ভাবনার কথা হয়েছে, জ্যেঠামশাই রেট্ খুব ভাল দিচ্ছেন, হিসেবের ওপরও একবার একটু হেসে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তখুনি যা হোক ফেলে দেন, রোজগার ভালোই হচ্ছে, কিন্তু থাকছেন না ত বেশী দিন উনি। শিগ্গিরই কলকাতায় চলে যাবেন, তারপর ফিরে দুটো দিনও থাকেন কি, না-থাকেন; তারপরেই আবার আজমীঢ়। সামনেই জন্মাষ্টমীর মেলা, জ্যেঠামশাইকে পেয়ে

কত মতলব আঁটিছে সবাই, কি কি কিনবে, কি করবে; কিন্তু সময় কোথায় আর? খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। বাড়ির অনেকেরও নজর পড়ল। ছোটকাকা প্রশ্ন করল—"হ্যাঁ রে, খাচ্চিস-দাচ্চিস তার ওপর রোজগারও করছিস ভালই, তবু যত ভাবনা যেন তোদেরই ওপর এসে পড়েছে, ব্যাপারখানা কি?"

দু'দিন পরে হঠাৎ যেন ভাবটা বদলে গেছে মনে হ'ল। ছোটকাকারই নজরে পড়ল আগে, সবদিকে তাঁর নজরটাই ত একটু বেশী থাকে। সন্ধান নিয়ে টের পেলেন যে, সবার আয় হঠাৎ বেড়ে গেছে। ছোট ভাইপোকে ডেকে বললেন—"ওরে একটু খোঁজ নিয়ে দেখ ত ব্যাপার কি? এমনি ত বড়দাকে যেমন খুশি ঠকাচ্ছে, তার ওপর আবার হঠাৎ আয় বাড়িয়ে ফেলল কি করে?"

বাপ অডিটার, ছোট ভাই বলল—"সেজবৌদি ওদের হিসেব করে দেন দাদা, অডিট ক'রে দেখব?"

অডিট করে কিছুই পাত্তা পাওয়া গেল না। যেতও না পাওয়া, কারুর ট্রেড সিক্রেট বের করে নেওয়া ত সোজা কথা নয়। তারপর কিন্তু একদিন আপনিই সমস্তটা বেরিয়ে পড়ল।

—সেই পুরনো ইতিহাস, যা নিত্য ঘটছে বাঙালীর ব্যবসায়। নিজেদের মধ্যে অনৈক্য। কার ভাগে একটু বেশী পড়ছে তাই নিয়ে ঈর্ষা, অন্তর্দাহ, তাই থেকেই এ-ওর কেচ্চা ছড়াতে আরম্ভ করলে, সব কথা পড়ল বেরিয়ে, কোম্পানীও গেল রসাতলে।

আয়টা সর্বপ্রথম বাড়িয়ে ফেলল রত্নাই; সব চেয়ে বড়, আগে তার মাথাই ত খুলবে। একটি দিনের হিসেবে দু'গুণ আয় করে নিল একেবারে, তাও হাত বুলনো বা সুড়সুড়িতে নয়, পাকা চুল গুণিয়ে দিয়ে।

রহস্যটা ধরতে পারল আগে হীরু, দিদির পরে ত ওই। তক্কে তক্কে থেকে রহস্যটা বের করল; কিন্তু একেবারে নকল না করে সেই পথেই একটা মৌলিক উপায়ে সেও দু'দিন পরে আয়টা প্রায় আড়াই গুণ করে নিলে। টুনীর আরও একটা দিন লাগল, তবে সে যা উপায় বের করল তাতে প্রায় তিনগুণ টেনে নিয়ে গেল। চার-পাঁচ গুণও স্বচ্ছন্দে করে ফেলতে পারত, অত সুবিধা সত্ত্বেও যে করল না, তার জন্য তার আত্মসংযমের প্রশংসাই করতে হয়।

কথাটা বেরুল প্রথমে রত্নার মুখ দিয়েই। দু'জনে ছোট অথচ দু'জনেই হঠাৎ

বাড়িয়ে নিলে আর তার চেয়ে, লেগেছে ত মনে। তার ওপর বোধ হয় লেনদেনের কথাও কিছু তুলেছিল, ওরা রাজী হয়নি।

চারজনে সেবা করছে, জ্যেঠামশাই পাশ ফিরে শুয়ে একটা বই পড়ছেন। একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছেন পড়তে পড়তে। অন্যদিকে ওরা গল্প করে, মাঝে মাঝে তাঁকেও টানে, আজ কিন্তু যেন অন্যরকম ভাব। কি যেন ইশারা বিনিময় হচ্ছে তিনজনের মধ্যে; মাথা নাড়ানাড়ি শাসানো, আঙুল উঁচানো। একবার ফিস্‌ফিসিনিও কানে গেল—"বলে দিই?"

রত্নাই জিগ্যেস করছে। হীরু সেই রকম ফিসফিসিনিতেই বেপরোয়াভাবে উত্তর করল—"দাও গে।...ইশ!"

বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। একটু চুপচাপ গেল। তারপর আবার—"তোমার কথাও।"

রত্নাই শাসাচ্ছে, এবার টুনীকে। বইয়ের আড়াল থেকে দেখা গেল টুনী ঠোঁট দুটো জড়ো করে মাথাটা দুলিয়ে দিল, বেপরোয়া ভাবেই। আবার একটু চুপচাপ গেল।

রত্না পায়ে হাত বুলাচ্ছিল, হাতটা আরও খুব মোলায়েম করে দিল, বেশ লম্বা লম্বা গোটাকতক টান, তারপর আরম্ভ করল—"জ্যেঠামশাই, ঘুমিয়ে পড়লেন?"

"না মা, কিছু বলবে?"

বইয়ের আড়াল থেকে সন্তর্পণে দেখা গেল হীরুর ওপর আবার তীর্যক দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে। হীরুও আবার বেপরোয়াভাবেই ফিরিয়ে দিল দৃষ্টিটা।

"বলছিলাম জ্যেঠামশাই—এই, আপনাকে ভালোমানুষ পেয়ে ঠকাচ্ছে হীরু।" (টুনীর দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ, সেও ফিরিয়ে দিতে)—"আর টুনীও। ওদের দেবেন না অত করে পয়সা।"

হাসি গুড়গুড়িয়ে উঠছে জ্যেঠামশাইয়ের পেটে। বললেন—"ঠকাবার পদ্ধতিটা কি, না হয় শুনি একবার, তবে ত বুঝব।"

আর একবার সেইরকম দৃষ্টি বিনিময় হ'ল।

"আপনি ভেবেছেন নাকি সবগুলো আপনার চুল? ব'য়ে গেছে। এই দেখুন এই কাঁচি। নিয়ে এসেছি আমি।"

"বুঝলাম না ত; কাঁচি ত কি?"

"ওগুলো সব নাকি আপনার চুল? দিদিমণির চুল বিকেলবেলা বসে বসে তোলে। তারপর কাঁচি দিয়ে আপনার মতন করে কেটে কেটে গুণে দেয়। একটাতে পাঁচটা, ছ'টা, সাতটা, আটটা যেমন হয়। সেখানেও পয়সা নেয় এখানেও আপনাকে ভালোমানুষ পেয়ে…"

হাসি চাপা কষ্টকর হয়ে পড়েছে জ্যেঠামশাইয়ের। কোন রকমে প্রশ্ন করলেন —"তাই নাকি?"

ওদিকেও যে নালিশ জমছে সেই প্রত্যাশায় কোন রকমে চেপে রেখেছেন হাসিটা।

রত্নাই বলছে—একবার যেন তীর্যক দৃষ্টিতে টুনীকে শেষবারের মতো সতর্ক করে দিয়ে—

"আর টুনীই কম নাকি—ঐটুকু দেখতে হলে কি হয়?"

"ব্যাপারখানা কি?"

"আপনি কি ভেড়া জ্যেঠামশাই? আমাদের কতো গুরুজন ত? দাদু, দিদিমণি ছাড়া সবারই গুরুজন। টুনী কম্বল থেকে বেছে বেছে শাদা শাদা ভেড়ার লোমগুলো…"

—আর বুঝি পারা যায় না; বুকটা চেপে ধরতে হয়েছে।

টুনীর একটা অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ গিয়ে পড়ল বত্নার ওপর। মাথাটাও একটু দুলে গেল। তারপর—

"হ্যাঁ জ্যেতামছাই, তা'বলে আপনি কি গোরু? বলুন না।"

—ভালো করে জিভের আড়ও ভাঙে নি।

শরীরটা দুলে উঠছে, তবু কোনরকমে বইয়ে মুখটা ঢেকে প্রশ্নটুকু করতে পারলেন জ্যেঠামশাই—"কেন গা মা?"

"ওগুলো আপনার ঘাড়ের চুল মনে করেছেন নাকি? ধবলীর পিত থেকে আঁচলে আঁচলে নিয়ে আসে দিদি…"

—দুই বোনে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বিনিময়ও হয়ে যায়। টুনী নাকমুখ একটু সিঁটকে নিয়ে বলে—"ইশ, ছবাই যেন জ্যেতামছাইয়ের মতন বোকা!"

রাখালরাজের মেলা

স্টেশন পর্যন্তই এসেছিলাম ; ফেরবার গাড়ি প্রায় দু'ঘণ্টা পরে, এতক্ষণ বসে বসে করা যায় কি ?

এখানে থেকে গঙ্গা বেশী দূর হওয়া উচিত নয় ; একটা কলও রয়েছে, ঐদিকটাই না হয় ঘুরে আসা যাক একবার। স্টেশনেরই একটা খালাসিকে প্রশ্ন করতে বললে মাইল দুয়েকের মধ্যে। হেঁটে যাবার সময় নেই, গরজও নেই এমন কিছু, এদিকে রিক্‌শা যা পাঁচ-সাতখানা ছিল, গাড়ি আসবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী নিয়ে গেছে বে'রিয়ে। ও খেয়ালই ছেড়ে দিয়ে একটা সিগারেট বের করে কেস্‌টার ওপর আস্তে আস্তে ঠুকছি, এমন সময় ক্রিং ক্রিং করে কয়েকটা ঘন ঘন শব্দ হ'ল, এবং আমি বেরুতে বেরুতে একটা রিক্‌শা এসে স্টেশনের প্যাসেঞ্জার শেডের বাইরে দাঁড়াল।

ড্রাইভার একটা সতের-আঠার বছরের ছেলে। কালো, ঢলঢলে চেহারা, মাথায় বাবরি চুল, চোখ দুটো টানা-টানা, সব মিলিয়ে এ কাজের সঙ্গে থাপ খায় না। একটু যেন তাড়াহুড়ো করেই এসেছে, যার জন্য ওর পুরন্ত মুখটা তামাটে হয়ে উঠেছে, চোখে একটা ব্যস্ত ভাব।…বেচারীর দেরি হয়ে গেছে, গাড়ির চান্স্‌টা গেছে নষ্ট হয়ে।

আমি বাইরে আসতে ওর মুখটা একটু দীপ্ত হয়ে উঠল, আমার কিছু বলবার আগেই প্রশ্ন করলে—"রিক্‌শা চাই বাবু ?"

এমনই একটা আকুল প্রত্যাশা যে দরকার না হলেও বোধ হয় করতাম ভাড়া। বললাম—"চাই, কলের দিকে যাব।" ওর মুখের দীপ্তিটা কে যেন একটা ফুৎকারে দিলে নিবিয়ে। ফ্যাল-ফ্যাল করে একটু চেয়ে থেকে বললে—"মেলায় যাবেন না বাবু ? রাখালরাজের মেলা…"

প্রস্তাবটা অদ্ভুত বলেই একটু হাসিমুখে চেয়েছিলাম, ছেলেটা বলে যেতে লাগল —"হেঁ বাবু, রাখালরাজের মেলা—এ তল্লাটে সে নাম করা মেলা—আপনি বোধ হয় কোলকেতার নোক তাই জানে না, রাখালরাজের মেলার মতন মেলা এ তল্লাটে কেউ দেখাক দিকিন একটা—কেন, রথও হয়, ওর নাম কি শেতলাও

হয়, ওলাইচণ্ডীও হয়, কিন্তু দাঁড়াক দিকি রাখালরাজের মেলার সামনে।…হেঁ বাবু চলুন—বসুন এসে…"

একটু তামাসা দেখবার জন্যে বললাম—"আমার কাজ যে কলে।"

"তা হোক বাবু—কল ত পালাচ্ছে নি

"বন্ধ হয়ে যাবে ত…হাজার দু'য়েক টাকা লোকসান…"

আশায় মুখটা একটু রেঙে উঠেছিল, আবার গেল নিষ্প্রভ হয়ে, একটুখানি নৈরাশ্যের হাসি রইল শুধু এক কোণে লেগে। প্রশ্ন করলাম—"কতটা দূর এখান থেকে?"

"আজ্ঞে, কোশটাক; এর বেশী হয় আমায় দু'ঘা দেবেন।"

"মিলের দিকে?"

"আজ্ঞে না, মিলটা হ'ল পূবে আর রাখালরাজা হ'ল—আপনার গিয়ে…"

আড়ে একবার উত্তরের দিকে চেয়ে একটু অপ্রতিভ হয়ে বললে—"আজ্ঞে আসুন দয়া করে—মেলা আবার সকাল সকাল ভেঙে যায় কিনা—এতদূর থেকে এসে যদি ভালো করে দেখতেই না পেলেন…"

হাসি পাচ্ছে; মেলা দেখতে আসি নি বটে, তবে এমন একটি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়াও কম কথা নয়। কিন্তু যেমন আহ্লাদে-আহ্লাদে দেখছি, তাতে বিদেশ-বিভুঁয়ে ওর হাতে নিজেরে ছেড়ে দিতেও মনটা খুঁৎখুঁৎ করছে; আবার বললাম —"ঠিক বলছিস ত কোশখানেক? ঘণ্টা দু'য়েক পরেই আমার গাড়ি, পৌঁছে দিতে পারবি ত স্টেশন?"

"আজ্ঞে ঐ ত বলনু—না পারি দু'ঘা দেবেন।"

"তাতে গাড়ি পাব?"

আবার একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসল, তারপর তাগিদ দেবার জন্যে রিক্‌শাটা একটু চালিয়ে, ঘণ্টিটা বাজিয়ে আব্দারের ভঙ্গিতেই হেসে বললে—"বসুন এসে, বসুন;—বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে ত?—ত্যাখন আবার বলবেন—দেখেছ? রেমো ব্যাটা দিলে ফেল করিয়ে গাড়িটা।"

"ভাড়া?"

"এক টাকা—এক পিঠের রেট বাবু—কম করলে ইউনিন্ থেকে নাম কেটে দেবে।"

"যেতে আসতে দেড় টাকা দোব।"

ঘাড় বেঁকিয়ে হাসলে।

"তাই দেবেন—তবে রেট ঐ, মিথ্যে বলিনি। আপনি তাই দেবেন, তবে কথাটা গোপনীয় রইল বাবু।...উঠে বসুন।...বামুন ত ?—পেন্নাম হই।"

বললাম—"হ্যাঁ, একটা কথা—মেলা যদি তেমন না হয়ত একটা পয়সাও দোব না কিন্তু।"

এর উত্তরটা পেলাম যখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছি।

—"রাখালরাজের মেলা বড় মেলাই, কিন্তু তা বলে কি আর রায়েদের রথযাত্রার মতন হতে পারে বাবু ? তা যে যতই বলুক না কেন। রথযাত্রা হ'ল আপনার বছরে একবার আর রাখালরাজ হ'ল মাসে মাসে, বারো মাসে আপনার গিয়ে বারোটা। ...আম সেই জষ্টি-আষাঢ়ে হবে একবার—তার সোয়াদ দেখুন, তার জলুস দেখুন আর পেয়ারা ফলছে ত ফলছেই—কখনও এক হতে পারে বাবু ?—আপনিই একটু বিবেচনা করে ক'ন না..."

রাগ হবারই কথা, কিন্তু সব তঞ্চকতা, সব জিদ কুতর্ক আর স্বার্থপরতার ওপরে ওর চেহারাটিতে এমন একটা মুক্ত সারল্য রয়েছে যে কোন মতেই টেনে আনতে পারছি না রাগটাকে। দু'ধারের উন্মুক্ত মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তা, ধানের সবুজ দোল লেগেছে, ওপরে আকাশের সমস্তটাই যায় দেখা, মনটাও কেমন আমার ছোটখাটো প্রবঞ্চনার ওপরে উঠে গিয়ে থাকবে। গল্প জুড়ে দিলাম। রামকানাইয়ের বাড়ি মিল এরিয়ার দিকেই, অতটা দূরে নয়, স্টেশন থেকে মাইল খানেকের মধ্যে। জাতিতে বৈরাগী। বাপ, মা, বুড়ো-ঠাকুরদা, দুটি বোন, নিজে। একটি বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, একটির হয় নি। ধেনো জমি আছে কিছু। আর রোজগার এই রিকৃশা টানা, এতেও দিন গেলে, দুটো টাকা আসে। রিকৃশাটা চালায় বাপই ; তবে রামকানাইয়েরও রপ্ত আছে ; বাপের কিছু হ'ল, নিজেই চালিয়ে নিলে।

নিজের সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে কানাই একটু হেসে হেসে যেন এড়িয়েই যেতে লাগল। বোঝা গেল, গেরস্ত ঘরের একমাত্র ছেলে, বাপের অতটা নাই হোক, মা আর ঠাকুরদাদার একটু বেশী পেয়ারের। চেহারাটিও সাক্ষী দেয়।

বিয়ের কথাও জিগ্যেস করলাম—"হয়েছে ?"

ফিরে ফিরে মুখের দিকে চেয়ে গল্প করছিল, আর চাইলে না, মাথাটা নীচু করে নিলে।

শরৎ-মধ্যাহ্নে এই মুক্ত প্রাঙ্গণের সঙ্গে চমৎকার মিলে যাচ্ছে বলেই থেকে থেকে কয়েকবারই প্রশ্নটা করলাম। ও যেন একটি চিরন্তন কিশোর, ওকে নিয়েই যেন এই চিরন্তন রস-বার্তা, কোন কুণ্ঠাই এল না আমার কণ্ঠে। বিয়ে ওর হয়েছে। কিছু বললে না বটে, তবে ওর কৈশোর-লজ্জার মধ্যে দিয়ে, আর প্রতি প্রশ্নের সঙ্গেই ওর প্যাডল্ চালাবার উৎসাহের মধ্যে দিয়ে উত্তরটা আপনি যেন ছেঁকে বেরিয়ে আসতে লাগল।

এর পর কিন্তু আমি আর এতটা নির্বিকার থাকতে পারলাম না। ওর একটা বদ অভ্যাস দেখে বরং বেশ একটু বিরক্তই হলাম।

পথটা ক্রোশ দেড়েকের কম নয়। এতক্ষণ লোক চলাচল একটু কম ছিল বলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিনি, বাঁদিক থেকে একটা নতুন রাস্তা এসে পড়তে দেখলাম। হতভাগার কমবয়সী মেয়েছেলে যেতে দেখলে একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখে নেবার রোগ আছে। এমনি বিরক্তিকর, তার ওপর রাস্তা-খারাপ, লোকের ভিড়, রিকশা উল্টে দিয়ে, কি কারুর ঘাড়ে ফেলে একটা দুর্ঘটনাও ঘটাতে কতক্ষণ? ঠিক সোজাসুজি বলতেও কেমন বাধ-বাধ ঠেকে, তবু কয়েকবার টুকলাম, বিশেষ কোন ফল হ'ল বলে মনে হ'ল না। তবে তখন প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছি, খানিক পরেই মেলার মধ্যে গিয়ে পড়লাম।

খুব বড় না হলেও নেহাৎ নিন্দের নয়। একটি ছোট খালই হোক বা নদীই হোক, তার কিনারায় মেলাটা বসে। একটি বৈষ্ণব বাবাজীর আখড়া আছে, দু'টি কদমগাছ, তার নিচে গোলপাতায় ছাওয়া ইটের দেয়ালের একটা ঘর, তাইতেই যুগল-বিগ্রহ। জায়গাটা বেশ প্রশস্ত, মাঝে মাঝে গাছপালা, যত্ন করেই লাগানো লতাগুল্ম, সবগুলিই বর্ষার রসে পুষ্ট; সব মিলিয়ে চমৎকার একটি বৈষ্ণব ভাব রয়েছে জায়গাটাতে। কলের ধোঁয় আর চিমনি থেকে রক্ষা করে রাখালরাজ যে এইখানে টেনে এনেছেন তার জন্তে তাঁকে মনে মনে প্রণাম করলাম।

কিন্তু যাকে দিয়ে এনেছেন টানিয়ে তার ওপর রাগটা আরও গেল বেড়েই। খানিকটা ভিতরের দিকে নিয়ে গিয়ে একজায়গায় রিক্শাটা দাঁড় করিয়ে নামল নিজে। একটু ব্যস্ত—যেন কিসের দেরি হয়ে গেছে, কি হারিয়ে যাচ্ছে, কি পালিয়ে যাচ্ছে। একটু অপ্রতিভভাবে হেসে, হাত কচলে বললে—"এই মেলা

বাবু, আমি একটু আসছি—এই এলাম বলে—আপনি এখানেই থাকবেন—রিক্‌শার ওপর দিব্যি বসে—"

বললাম—"আমি রিক্‌শা আগলাব তোমার, আর তুমি টহল দিয়ে বেড়াবে? বলতে লজ্জা করল না?"

একটা দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হঠাৎ চেয়ে নিলে, তারপর সেই ভাবেই বললে—"আজ্ঞে না, সেকথা নয়, আপনিও দেখুন না, রিক্‌শা নিয়ে কে যাবে—হুকের ধন, নম্বর দেওয়া···আর ইয়ে বাবু, ভাড়াটা যদি দিয়ে দেন—দু'পিঠেরই···"

"এক পিঠেরও পাবি না। ঠিক দশ মিনিট সময় দিলাম, যদি এর মধ্যে না ফিরে আসিস ত তোকে পুলিসের হাতে দোব, তোর লাইসেন্স কাড়িয়ে দোব। যা, ঠিক ঘড়ি ধরে দশ মিনিট—ওর মধ্যেই ফিরে আসবি। মস্ত বড় মেলা! ধাপ্পাবাজ!"

ঘাড় ফিরিয়ে হেসেই চলে গেল।

ওদিক'কার রাগ এদিক'কার অনুরাগের মধ্যে কখন গেছে ডুবে, জানিনা। বড় মধুর লাগছিল, আমার গাড়ি যখন ওদিকে বেরিয়ে গেছে তখনও আমি ঘুরেই বেড়াচ্ছি এখানে-ওখানে। ঘণ্টা দেড়েক পরে আর একটা যে গাড়ি তাইতে যাব।

বিকেল গড়িয়ে এবার সন্ধ্যা হবে, মেলা পাতলা হতে আরম্ভ হয়েছে।

গোষ্ঠ ত ভাঙল, কিন্তু কোথায় রাখালরাজ?···মা যশোদার মতোই কেমন একটা কান্না ঠেলে উঠছে চোখে—একটা অজানা আশঙ্কা···ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছি, কাকে যেন খুঁজে খুঁজে। অন্যমনস্ক ভাবেই কণ্ঠে একটা ব্যাকুল পুরবী গুণগুণিয়ে উঠছে—ঢুঁর ঢুঁর গ্যাও হার হার···খুঁজে খুঁজে যাচ্ছি হেরে, যাচ্ছি সারা হয়ে, হে রাখালরাজ, এই কি সময় তোমার—যমুনা পুলিনের মালতী কুঞ্জে···

নিরুদ্দেশ ভাবেই ঘুরতে ঘুরতে আখড়ার পেছনদিকটা একটা জায়গায় এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হ'ল, কণ্ঠের গুণগুণানিও গেল থেমে আমার।

সেই হতভাগাটা, তখন পর্যন্ত ত তা-ই আমার দৃষ্টিতে। একলা নয়। একটা ছোট চালা, আখড়ার সব ঘরগুলার মতই একটু লতায়-পাতায় ঢাকা, তবে এমন কিছু প্রচ্ছন্ন নয়, যদিও একটু বোধ হয় একটেরেয়। তারই ধারটিতে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে, পাশেই একটি মেয়ে, একটা হাতে ভর দিয়ে পা ছড়িয়ে

বসে। বয়স প্রায় ঐ রকমই, দু'এক বছর কম হতে পারে। আমি গিয়ে পড়লাম মেয়েটার খিল-খিল করে হেসে ওঠার মধ্যে।

আপাদমস্তক জ্বলে গেল, কিন্তু বলার কি আছে ভেবে না পেয়ে শুধু প্রশ্ন করলাম—"দশ মিনিট তোর এখনও হয় নি, না?"

সেই একটু অপ্রতিভ হাসি নিয়ে উঠে পড়ল, একটু দাঁড়িয়েই রইল, তারপর মেয়েটার দিকে চেয়ে হুকুম করলে—"গড় কর এনাকে। বামুন।"

সরে দাঁড়াতে যাচ্ছিলাম, সেইভাবেই হেসে বললে—"আজ্ঞে, পরিবার আমার।"

কথা তখনও মুখ দিয়ে বেরুচ্ছেনা, চেয়েই আছি, বলে চলল—"এই যে নতুন রাস্তাটা এসে পড়ল, উইদিকে ওদের ঘর—সরখালি।...কুল করা নিয়ে যে এর বাবার আর আমার ঠাকুরদার এইরকম..."

দু'হাতের দুটো তর্জনীতে লাগিয়ে আড়াআড়ির ভাবটা দেখাচ্ছে, এমন সময় আখড়ার ওদিক থেকে ললিতা-সখী এসে উপস্থিত হ'ল।

তা ভিন্ন আর কি নাম দোব?

বেশ সপ্রতিভ, বৈরাগীরা সাধারণতঃ যেমন হয়ই; বছর ত্রিশেক বয়স, কপালে উলকি, নাকে রসকলি। এসে ছেলেটাকে প্রশ্ন করলে—"ইনি কে গো কুটুম?"

পরিচয়টা শুনে একটা নমস্কার করলে হাত তুলে। ছেলেটার শেষের কথাগুলো বোধ হয় শুনেছিল, একটু হেসে বললে—"দেখুন না গেরো। আমার বুন, খুড়তুতো, তা কাকার সঙ্গে আর ওর ঠাকুরদাদার সঙ্গে কুল করা নিয়ে রেষারেষি—তা সে এমন যে, সে যেন আর এ-জন্মে মিটবে না, মিটবে, তবে বুড়ো ম'লে...তা কুটুম চটছে ত আর কি করব?—ওনার বাপ ত ত্যাত খারাপ, বলছি না...এই অবস্থা। আমারই ভোগান্তি, মাসে এই একবারটি করে নিয়ে আসি ওকে, বলি চল, রাখালরাজের পায়ে মাথা কুটবি চল্...ও কুটুম, ওদিক'কার কাহিনীটাও দোব নাকি ফাঁস করে?"

মুখটা ঘুরিয়ে মুখে মুঠো চেপে খিলখিল করে হেসে উঠল।

ওদিকে, বড় চালাটার মধ্যে টুং টাং কি শব্দ উঠেছে, নিশ্চয় রাখালরাজের আরতির আয়োজন হচ্ছে। আজ ওটা দেখে না গেলে যেন কোথায় মস্ত বড় একটা ফাঁক থেকে যাবে বলে মনে হচ্ছে। আমার ফেরবার গাড়ি তা'হলে হ'ল আরও এক ঘণ্টা পরে, সাতটা তিরিশে।

একাল

একে পাড়াগাঁ, তায় বাড়িটা একেবারেই পুরনো চালের।

পুরনো চালই ভালো, আর রাখতে হবে তাই বজায়। অন্ততঃ ভুবনমোহিনী যতদিন বেঁচে আছেন।...ভগবান মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু দিয়েছেন, যা দেখছেন চারিদিকে, যা সব শুনতে হচ্ছে তাই যথেষ্ট, অনেক নাকি পাপ করেছিলেন আর-জন্মে, তার সাজা; আবার নিজের বাড়িতেও নাকি আমদানি করতে হবে ঐ সব অনাচার?...উনি ম'লে যা খুশি করবে'খন সবাই, সেখান থেকে দেখতে আসবেন না, যতদিন আছেন ততদিন চলবে না; তা'হলে ওরা কাশী পাঠিয়ে দিক ওঁকে।

অনাচার বৈকি।...পুরুষেরা যা করে করুক; ওদের ভগবান পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন কেন? তা'বলে তোদেরও ওদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে তাই করতে হবে? ওরা কোঁচা দুলিয়ে স্কুলে যায় বলে, ওদের দেখাদেখি তোদেরও মাথার বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেতে হবে?...ওরা কলেজে যায় ত আমরাই বা কেন যাব না?...তা'হলে তোরা এক কাজ কর না—ওদের মত কাছা আঁট্। বলে যে—মেয়েদের দশহাত কাপড়ে কাছা জোটে না, তাই-বা সইবি কেন? কাছা দে, কোঁচা ঝোলা, আপিসে যা, ফিরে এসে সায়েব-মেমের মত মাইডিয়ার বলে হাত-ধরাধরি করে হাওয়া খেগে।...বাড়িতে এসেও হাওয়াই খাস, কেন মরতে হেঁসেলে গিয়ে ঢুকবি?

শোনা যাচ্ছে নাকি শহরে আরম্ভও হয়ে গেছে। তা যাবে; বেঁচে থাকলে আরও সব শুনবেন ভুবনমোহিনী।

শোনা কেন, হয়ত দেখতেও হবে।

গ্রামে কোন বালাই ছিল না। রঘুপণ্ডিতের পাঠশালা, যার শখ হ'ল, ছেলের সঙ্গে মেয়েটাকে দিলে পাঠিয়ে। বাড়িতে পুতুল নিয়ে না খেলা ক'রে সেখানে বই-স্লেট নিয়ে খেলা। তার মধ্যে পুণ্যিপুকুর আছে, যমপুকুর আছে, তুষুলি আছে। বাদসাদ দিয়ে যে ক'টা দিন বাঁচল, যা শিখতে পারল শিখল; বিয়ের কথা উঠল, ঢের পড়া হয়েছে, এবার এসে ছাঁদনাতলায় ওঠ। এই ছিল ব্যবস্থা আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। তারপর হ'ল মেয়েদের খাস ইস্কুল, আর

এক ধাপ নাকি উঁচু। তা ছেলেদের সঙ্গে মিশে মিশে ধিঙ্গি হয়ে যাবে, কেন, যাক সেখানে। আবার নূতন ঢো উঠেছে ছেলেদের মতন মেয়েদেরও নাকি আবার একটা পাশ দেওয়ার স্কুল হচ্ছে!

মাঝেরপাড়ার যতীনের কাণ্ড এই সব, ও যেন উঠে-পড়ে লেগেছে, গাঁ-খানাকে রসাতলে না দিয়ে ছাড়বে না। ভুবনমোহিনী ডেকে পাঠালেন।

"ও যতীন, একি শুনছি আবার! মেয়েদেরও নাকি পাশ দেওয়ার স্কুল করছ?"

যতীন যেমন বলে, হেসেই বলল—"নৈলে মেয়েরা কোথায় যাবে ঠানদি?"

"ওমা, তুমি যে উল্টো বললে ভাই! এখন ত দিব্যি ঘরেই রয়েছে, পাশ দিলেই বরং কোথায় যাবে সেই ভাবনা। ইস্কুল থেকে কলেজ, তারপর চাকুরি খুঁজতে বেরোও। চাও তাই?"

যতীন হেসে বলে—"তা কি চাইতে পারি? তবে তোমার নাতবৌয়ের দল যে চায়, আমি কি করব?"

ভুবনমোহিনী ঠোঁট চেপে মাথাটা দুলিয়ে নেন—অর্থাৎ এতক্ষণে বুঝেছেন।

"তা পড়াবে কারা?"

"আপনার নাতবৌই ত ঝুঁকেছে। একজন। বাকি সব বাইরে থেকে আসবে।"

"টেড়ি-কাটা ছোকরা মাস্টারের দল ত? বুঝে-সুঝে এগিও বাপু।"

যতীন হেসে বলে—"ওদের কে তোয়াক্কা করে আর ঠানদি? ন'টি মেয়ে মাস্টারের দরকার, দরখাস্ত পড়েছে একশ' পাঁচ।"

"বলিস কি গো! এত অধঃপাতে গেছে দেশটা!"

দুটি নাতনী যে ইস্কুলে পড়ছে,—আগে পাঠশালায় ছিল, নূতন মেয়ে-ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে, তাদের তাড়াতাড়ি সরিয়ে নেন। কোন আপত্তি টেঁকে না। ভুবনমোহিনী বলেন—"ঠাকুর আজ আমায় নিয়ে নেন, কালই আবার তোদের মেয়েকে পাঠিয়ে দে, দেখতে আসব না।···না হয় এক কাজ কর না, আমায় কাশীতে রেখে আয়, ল্যাটা চুকে যাক একেবারে।"

ঐ ত এক-একটি নমুনা। ঐ চিত্রা, যতীনের বৌ, নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরপাক খাইয়ে বেড়াচ্ছে সোয়ামীকে। আসে মেয়েটা মাঝে মাঝে, চোখে চশমা, মুখে

খই ফুটছে।…"বিদ্যে সে ত আমাদেরই জিনিস ঠান্‌দি, মা-সরস্বতীর এলাকায়; পুরুষেরা কত সাধ্যি-সাধনা, কত খোশামোদ করে নিয়ে এখন মৌরসী করে বসে আছে। তোরা হাঁড়ি ঠেলে মর। ঘুচিয়ে দিতে হবে না মৌরসীটা?"

বড় বৌমা বলেন—"তুমি চটো ব'লে তোমায় ঐ ক'য়ে চটায় মা, নৈলে মেয়েটা ভালো। একটু শহুরে ঝাঁজ আছে, তা ও আর কতদিন থাকবে?"

ছোট বৌয়ের কথায় একটু লাগে, মুখটা অল্প ঘুরিয়ে নিয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করে—"যা জায়গায় এসে পড়েছেন!"

শাশুড়ীরও লাগে, বলেন—"সে দুঃখু করতে হবে না মা, জায়গার চেহারা পালটে দিচ্ছেন একেবারে। সাধ করে কি বলি—নিজের নিজের ঘর সামলাও সব। আবার ঐ মাস্টারি করতে চললেন।"

রায়-গিন্নী ত শুধু কাঁদতে বাকি রাখেন, তাঁর তবু বড় ইস্কুলে পড়া বৌ নয়। বলেন—"কি বলব খুড়িমা, মনে করলাম, তা হোকগে, আমরা একেবারে মুখ্যু, ধোবার হিসেবটা লেখাব তাও এর-ওর খোশামোদ করে, একটু লেখাপড়া জানে, আজকালকার মেয়ে, তা ওটুকু সংসারের কাজেই লাগবে। বয়েস হয়েছে, রামায়ণ মহাভারতটাও ত পড়ে শোনাতে পারবে নিদেনপক্ষে।…শোনাচ্ছেন! কুটোটা নেড়ে উপকার করবে না, যখনই দেখো বই মুখে করে বসে আছেন রাণী। আর নিত্যি একটা-না-একটা অসুখ লেগেই আছে। ছেলেটার ত আর কিছু পদার্থ রাখলে না! সোয়ামী, কোথায় একটু সমীহ-ভক্তি করবি, পেয়াদার বেহদ্দ করে তুলেছে; খালি বই যোগাও আর ওষুধ যোগাও।…এখন আবার সুর ধরেছেন, যতীনের বৌ নাকি ইস্কুল খুলছে, তাইতে পড়বেন। নাও, ষোলকলা পূর্ণ হ'ল এবার।"

ভুবনমোহিনী বলেন—"আমাদের ছোট বৌমাকে বলোগে একটু। মেয়ে দুটোকে ছাড়িয়ে নিয়েছি তা কত রাগ!…মেয়েদের দোষ ঢুকছে তার জন্যে লেখাপড়াকে দায়ী করলে চলবে কেন? বরং লেখাপড়া করছে বলে অনেক কেটে যাচ্ছে দোষ, বুঝতে শিখছে, ভাবতে শিখছে। একবার শোননা বসে লেখাপড়ার হয়ে ওকালতিটা। সেকালের মুনি-ঋষিদের পরিবারেরা শিখতেন লেখাপড়া, ছড়া তোয়ের করতেন মুখে মুখে।…বলি—তা করতেন বৈকি, নৈলে সোয়ামী-পুত্রকে বাকলা পরিয়ে ছাড়বেন কি করে? আমরাও মুনি-ঋষির পরিবার না হই, বছরে চারখানা কাপড়ের সুতো কেটে দিয়েছি সোয়ামী-পুতের

জন্যে, পূজোর ঘর সামলে, হেঁসেল সামলে, কুঁচোকাঁচাদের তদারক করে। আর যার দাসী করে ঠাকুর পাঠিয়েছেন, তার জন্যে কি কি যে করতে হয়েছে তা পাপ মুখে আর নাই বা বললাম।"

এ ত গেল নতুন যারা বৌ হয়ে আসছে গ্রামে। শহরের চাল, বাপ-মা নজর রাখে নি, দোষই বা কি ওদের? কিন্তু গাঁ-ও যে এদিকে বিগড়ে যাচ্ছে, এমন সোনার গাঁ।

আবার শোনা যাচ্ছে বড় ইস্কুলের টাকা তোলা হবে, তার জন্যে মেয়েরা নাকি থিয়েটার করবে।

হুজুগে মাতবার লোক আছে বৈকি গ্রামে, নৈলে ঢুকছে কি করে এসব অনাচার? তবে বোঝবার লোকও যে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে এমন নয়। রায়-গিন্নী আছেন, ঘোষাল-গিন্নী আছেন, পুরুষোত্তমের খুড়ী আছেন, সদানন্দের পিসী আছেন, আরও সব আছে, চারপো কলি ত এখনও হয় নি।

সবার ওপরে আছেন ভুবনমোহিনী।

শিবানীকে কচি বলেই ধরা যায়, কিন্তু অনাচারের ভয়ে ইস্কুল থেকে সরিয়ে আনার পর ভুবনমোহিনী যেন হঠাৎই আবিষ্কার করে ফেললেন যে, মুক্ত অর্থাৎ মুক্তকেশীর বয়স হয়ে গেছে। যুগের প্রভাব বলে একটা জিনিস আছেই, ঘরে ঘরেই পনের, ষোল, সতেরো, আঠারো পর্যন্ত অনূঢ়া মেয়ে, তার মধ্যে দৃষ্টির নীচেই চৌদ্দ বছরের একটি যে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে, সেটা অতটা নজরে পড়ে নি। একটা যে আসন্ন বিপদ এসে পড়ছে গ্রামের মধ্যে তার পরিপ্রেক্ষিতে, বয়সটা হঠাৎ যেন তার ভয়াবহ গুরুত্ব নিয়ে ভুবনমোহিনীর চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। এই পরিবারেরই প্রাক্তন ইতিহাসটা হঠাৎ তিরস্কারের ভ্রূকুটি নিয়ে উঠল জেগে। ...ভুবনমোহিনী নিজে এ-বাড়িতে আসেন এগারো বছর বয়সে। তিনটি বধূ, তার প্রথম দুটি তেরোর আগেই পা দিয়েছে শ্বশুরবাড়িতে। ছোটছেলের বেলায় হতে-করতে কি করে হয়ে গেল একটু দেরি; ছোট-বৌ এসেছে ষোল বছর পেরিয়ে। অবশ্য কড়া শাশুড়ীর পাল্লায় পড়ে আর মাথা তুলতে হয় নি, তবু আড়াল-আবডাল থেকে মাঝে মাঝে একটা-আধটা নমুনা ছাড়বার চেষ্টা করেন বৈকি।

না, পরের ঘরে যাবে মেয়ে, ভুবনমোহিনী বিচলিত হয়ে উঠলেন। বাড়ির

যা চাল সেই অনুযায়ী ঠিকঠাক করে তোয়ের করে দিতে হবে। যা গাফিলতি হয়ে গেছে একটু তার আর চারা নেই, ভুবনমোহিনী উঠে-পড়ে লাগলেন।

এদিককার যা সব তা বাড়িয় সাধারণ চাল হিসাবে কিছু কিছু হয়েই আসছিল,—ঠাকুরঘর, ব্রত, হেঁসেলের দিকের ছোটখাট পাট, শিক্ষা হিসাবে; ঘর-দোর ঝাড়া-মোছা—হয়ে আসছিল সব, শুধু আরও বাড়িয়ে দিয়ে বই-কাগজের সময়টা একেবারে সঙ্কুচিত করে দেওয়া হ'ল মাত্র; কিন্তু এই নূতন পর্যায়ে ভুবনমোহিনী সবচেয়ে বেশী অভিনিবিষ্ট হলেন অন্য এক দিকে।

আজকালকার মেয়েরা যদি বা কুঁতিয়ে-কাঁতিয়ে কোনরকমে একটু-আধটু গৃহিণী হয়ে উঠছে, সংসারের চাপে, শাস্ত্রমত বধূ কিন্তু হতে পারছে না একেবারে। স্বামীভক্তি বলে জিনিসটা নেই বললেই চলে, কেমন যেন একটা হেলাফেলা ভাব। বলেন চিত্রাকে, ঐ মেয়েটা এ-যুগের যেন প্রতিনিধি ভুবনমোহিনীর কাছে, যত নূতনত্বের আমদানি করছে ঐ, যত অঘটন ঘটাচ্ছে ঐ। চিত্রা চোখ দুটো বড় বড় করে বলে,—"ভক্তি কি ঠান্‌দি! আমবা একালে বুঝি ভালোবাসা। ঠাকুর-দেবতার ওপর ভক্তি, সে বোঝা যায়, বাপ-মা আর যাঁরা বড় তাঁদের ওপর ভক্তিও বোঝা যায়, তাঁবা দেবতা, এঁরা গুরুজন। তা'বলে সোয়ামী, যার সঙ্গে নাকি ভাগাভাগি করে ঘর-সংসার করছি, অষ্টপ্রহর পাশাপাশি থেকে, তাকেও যদি ভক্তি কবতে হয় তো ভক্তির চাপে যে দম বন্ধ হয়ে যাবে!"

ভুবনমোহিনী বলেন—"আমরা সব দম বন্ধ হয়ে মাবা গেছি!"···চিত্রা হেসে বলে—"মারা ত গেছেনই ঠান্‌দি, এ বরং আরও সাঙ্ঘাতিক মারা যাওয়া। 'গুরুদেব-গুরুদেব' করে ভক্তির চোটে যদি ভালোবাসাটাকেই ফেললাম মেরে, আমাদের জীবনে নাকি সবচেয়ে যা বড় পুঁজি, তা'হলে শুধু কাঠামোটা রেখে ফল কি?"

বড় বৌমা বলেন—"তুমি চটো বলে তোমায় আরও ক্ষেপায় মা, নৈলে মেয়েটা ভালো, শুনি ত ওদের বাড়িতে। ঠাকুর ঘর থেকে নিয়ে যতীন পর্যন্ত সব দিকে নজর।"

হোক ভালো, তবে ওদের এই ভালোবাসা-ভালোবাসা যে এক অনর্থ হয়েছে একালে এতে আর সন্দেহ থাকে না ভুবনমোহিনীর। আমরা ভালোবাসি—আমরা একালে সব সমান-সমান।···সমানটা কিসে আমায় বুঝিয়ে বল্; বয়সে, না বিদ্যের, না ক্ষমতায়, না বুদ্ধিতে। একটা গালভরা কথা শিখে শাস্ত্র-পুরাণ

সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিলে। ভুবনমোহিনী বলেন—"তোরা সমানই বা কোথায়? পা থেকে একেবারে মাথায় উঠেছিস। সমান হলেও ত বুঝতাম।" চিত্রা হেসে বলে—"সেটা আমাদের এ-যুগে এদের একটু বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে বলে ঠান্দি; বুঝতে পেরেছে ঐটেই আমাদেব ঠিক জায়গা। দেখ না, শিবঠাকুর কত আগে সেটা ধরতে পেরেছিলেন।"

ভালো লাগে না ভুবনমোহিনীর। কড়া হাতেই ধরে আছেন সংসারের লাগাম, তবু ভয় হয়। ওপরে-ওপরে ঠিক থাকলেও ভেতবে-ভেতরে যেন বদলে আসছে বাড়ির হাওয়া। বড় বৌমার পর্যন্ত যেন চিত্রার দিকে টান। চাপবার চেষ্টাই, তবুও কথাবার্তায় প্রকাশ হয়েই পড়ে মাঝে মাঝে। ছোট বৌমার সঙ্গে ত গলায়-গলায়।

সবাই যাবে। তবু প্রথম নাতনীটিকেও যদি নিজের হাতে বিদেয় করে যেতে পারেন, নিজেব মনের মত করে, তা'হলেও একটা সান্ত্বনা থাকে। ঘটক লাগিয়েছেন চারিদিকে। এদিকে মুক্তকে একেবারে নিজেব হাতে নিয়ে নিয়েছেন। মেয়েটি খুবই ভালো। একে এই বাড়িব রসে পুষ্ট, তার ওপর পিতামহীর খাস তত্ত্বাবধানে, দু'দিন ইস্কুলে গিয়ে, মনে কোথাও যদি ছোপ-ছাপ একটু ধরেছিল, সব নিঃশেষে মুছে গিয়ে সেবাময়ী ভক্তিমতী বধূ এবং নিষ্ঠাবতী গৃহিণী জীবনেব জন্য তোয়েব হয়ে উঠতে লাগল।

বিবাহেরও ঠিক হ'ল। অনেকগুলি পাত্রের মধ্যে থেকে নিজেই একটিকে বেছে নিলেন ভুবনমোহিনী।

বাড়ির চাল একেবারে পুবনো, যতদুব খবব পেলেন ছোট বৌযেব মত কেউ এখনও ঢুকতে পায় নি বাড়িতে। এদিকে ভুবনমোহিনী একা, ওদিকে ছেলেব পিতামহ-পিতামহী উভয়েই বেঁচে।

ছেলেটিকেও দেখলেন, ফটো আনিয়ে। বেশ লম্বা-চওড়া, এদিকে উঠতি বয়সে যে গুম্ফ-শ্মশ্রুব আবির্ভাব হয়েছে মুখে, তাব কোনটিতেই হাত দেয় নি। সব মিলিয়ে যে একটা অটল গাম্ভীর্যেব সৃষ্টি হয়েছে তাতে বোঝা যায়, একালের মেয়েদের মিনমিনে ভালোবাসায় ভোলবার পাত্র নয়; কড়ায় গণ্ডায় ভক্তি-নিষ্ঠা সেবা-বাধ্যতা আদায় করে নিয়ে তবে ছাড়বে। এদিকে বিত্তেরও ওজন আছে, চারটে পাশ।

দূরের দিকেও গেলেন না ভুবনমোহিনী। দুটো গ্রাম পেরিয়েই ছেলের বাড়ি। ওদিকে দাদাশ্বশুর দিদিশাশুড়ী রইলেনই, এদিক থেকে ইনিও এক রকম দিনের-দিনের হিসাব রেখে যেতে পারবেন।

ঠিকুজি মিলিয়ে দেখা গেল—রাজযোটক। তা হবেই, নইলে এত তোড়জোড় করলেন কিসের জন্য ভুবনমোহিনী?

যথাপদ্ধতি দিন ক্ষণ দেখে বিবাহ হয়ে গেল।

কিন্তু ভস্মে ঘি ঢালা হ'ল।

ছেলেটি মন্দ ত নয়, বরং আর সব দিক দিয়ে ভালোই, তবে ভুবনমোহিনীর সন্দেহ কোন্ ফাঁকে কি করে ভক্তির জায়গায় ভালোবাসা সাঁদ করিয়ে বসে আছে। প্রথম ত মাসখানেক না যেতে যেতে ভক্তি নিষ্ঠা আদায় করবার দুটো অস্ত্র একেবারে ঘুচিয়ে ফেলল। একটা আঘাত পেলেন ভুবনমোহিনী।

"হ্যাঁ রে মুক্ত, একি তোর আবদার নাকি? গোঁফ দাড়িতে অমন দিব্যি পুরুষালি চেহারা ছিল নাতজামাইয়ের···"

মুক্ত বলে—"আমি কেন বলতে গেলুম?"

কোথা থেকে চিত্রার ওপর গিয়ে রাগটা পড়ে, তাকেই ঠেস দিয়ে বলেন ভুবনমোহিনী—"না, তোদের মুখে আজকাল সমান-সমানের বুকনি বড় শুনি কিনা, তাই জিগ্যেস করছি।··আর আলাদা কিছু রইল না ত। এবার নাকে নাকছাবি দিয়ে কানে দুটো দুল ঝুলিয়ে দিলেই হয়।"

দিন যায়। ভুবনমোহিনীর যেন কেমন-কেমন মনে হয়! মেয়েটা ভাবে-গতিকে যেন চিত্রার দিকেই আস্তে আস্তে এগুচ্ছে। সর্বনাশের সূচনা হয়েছে। ভুবনমোহিনীর মনটাও যেন অন্য রকম হয়ে আসছে। তেমন স্পষ্ট কিছু নয়, তবু যেটা চিত্রার মধ্যে খারাপ লাগত, মুক্তর মধ্যে যেন তত খারাপ লাগতে চাইছে না, ভয় পান। ভয় পান বলেই, নিজের ওপর কড়া হয়ে ওঠেন, আরও আগ্রহ করে জিগ্যেস করেন—

—"তা হ্যাঁ রে মুক্ত, যেমন যেমন বলে দিয়েছি, করে যাচ্ছিস ত?···সকালে পায়ের ধুলো নিয়ে ওঠা। রাত্তিরে শোবার আগে একটু পা দুটো টেনে নিয়ে টিপে দিলি ··"

বলতে চায় না মুক্তকেশী। তারপর শপথ দেওয়ায় বিরক্ত হয়ে বলে—"দিলে তবে ত ও-সব করব।"

—"দেবে না কি রে! ও-সব যে ওদের পাওনা। সেই কোন্ রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে পেয়ে এসেছে।…বলে কি?"

বলতে চায় না মুক্ত, তারপর শপথ দেওয়ায় বলে—"বলে, ওসব কেন? দাসী নাকি?"

—"দাসী নয়!! হ'ল কি এরা কালে-কালে!"

—এত বিস্মিত হয়ে পড়েন ভুবনমোহিনী যে আর বাক্যস্ফূর্তিই হয় না।

*

এদিকেও চেষ্টার ত্রুটি করেন না। কাছেই শ্বশুরবাড়ি, যাওয়া-আসা লেগেই রয়েছে নাতজামাইয়ের। খানিকটা ঠাট্টার ওপর দিয়েই চলে।

—"এই বেশ হয়েছে, সইকে ত আর সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারল না নাতনী আমার।…তা কি পাতানো হ'ল নাতজামাইয়ের সঙ্গে—আতর, না গঙ্গাজল?"

ছেলেটি মুখচোরা, মাথা নীচু করে শুধু হাসে। উপদেশ-পরামর্শও চলে—"সময় থাকতে কাজ বাগিয়ে নাও ভাই; এই যে বয়েস, এই সময় মনটা থাকে নরম, যেদিকে নোয়াবে সেদিকেই নুইবে। দেখচ ত অবস্থা চারিদিকে, দেখে শিখতে না পার, ঠেকে শেখা, সে বড় ঝঞ্ঝাট।"

ওসকানিও থাকে—"শিখিয়ে-পড়িয়ে হাতে তুলে দিয়েছি; এখন শুধু নজর রেখে যাওয়া। কড়া হাতে আদায় করে নেবে। তোমাদের দাদু-দাদামশাইরা জানত। ওকি, পুরুষের হাতও যদি চুড়ি-পরা হাতের মতন নরমই হ'ল ত তফাতটা আর রইল কোথায়?…মাঝে মাঝে উপদেশ দেবে সোয়ামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা কি—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সোয়ামীকে কি বলে গেছেন…"

উত্তরে সেই এক ধরনের হাসি।

রাগ ধরে বৈকি; করে-কর্মে দিলেন এত করে, সব নষ্ট হতে বসেছে; চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, কোন ফল হচ্ছে না, শুধু ঐ হাসি। রাগই ধরে, তবে কিছু বলতে পারেন না, ঝালটা ঝাড়েন নাতনীর ওপর—

—"বিগড়ে দিচ্ছ বাপু। মেয়েছেলে সে পুরুষের সঙ্গে ঘর করবে এই হ'ল নিয়ম। 'দাসী নও, মাথার মণি'—ওসব এখন শুনতে বেশ মিষ্টি। কথায় ভুলে, নিজের কাজ ভুলে যদি সত্যি মাথার মণি হয়ে বসো, তথন ঐ পুরুষই

বলবে ঝেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচি। তার চেয়ে যেখানে ঠাঁই নিজের সেখানেই থাকি সেই ভালো।···আর বলে ও-সব কথা?"

উত্তর দেয় না মুক্ত, তার পর পীড়াপীড়ি করায় বলে—"এখন উল্টো বলে।"

"উল্টো মানে!···উনিই দাস তোমার, এই ত?"

মুক্তকেশীর মাথাটা একটু নীচু হয়ে যায়।···খুব এমন রাগের কথা নয়, বোধ হয় কিছু মনেও পড়ে যায় ভুবনমোহিনীর। তবে রেগেই যান; সে ছিল প্রবল অধিকারবোধের মধ্যে, এক-আধবার শুধু মুখে ব'লে ফেলা; আর এ হ'ল সত্যিই হীন দাসত্ব—এত চেষ্টা সত্ত্বেও যার উপায় করতে পারছেন না ভুবনমোহিনী। রেগেই যান, মুখটা কুঞ্চিত করে বলেন—"ঘেন্নায় মরি! কি হ'ল এরা গো! পুরুষ, না, কি?···তা বলুক গে, তোকে যেমন বলে দিয়েছি—জোর করে পা দুটো টেনে নিয়ে···"

"দেয় না যে কোন মতেই—আমি কি করব?"

ভুবনমোহিনী একেবারে ফেটে পড়েন—

"কিচ্ছু করতে হবে না তোমায়। বলবে তুমি, এবার ভোলানাথ শিবের মতন বুক পেতে শোও, আমি রণরঙ্গিনী হয়ে ধেই ধেই করে নাচি। এ সব মেনীমুখো পুরুষদের বরাতে তাই আছে।···এত বলছি, এত করছি, কোনমতেই ধাতে আনতে পারছি না গা!"

দিদিমণির বেড়াল

একটা ছোটখাট আলাদা বাড়ি হ'লেই ছিল ভালো, কিন্তু তা পাওয়া গেল না। অগত্যা এই ব্যবস্থাই করতে হ'ল।

একটা মাঝারি গোছের একতলা বাড়ি ; এক পাশে টানা পাঁচিল দিয়ে তারই ছোট ছোট দুটো ঘর, খানিকটা রক আর খানিকটা উঠোন আলাদা করে দেওয়া হয়েছে, একজনের বেশ চলে যায়। বিদেশে চাকরী করতে আসা, আত্মীয়-স্বজন না থাক, একটি পরিবারের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকাও একটা ভরসার কথা। অফিসের লোকের কাছে, আর খানিকটা এদিক-ওদিকেও খবর নিয়ে জানল, পরিবারটি ভদ্র।

নতুন চাকরী নিয়ে এখানে এসেছে সরোজ। পরিচয়াদি হয়নি এখনও। দশটা-পাঁচটা অফিস করে, সকালে কিছু অফিসের ফাইল, বিকালে একটু ঘুরে আসা, তারপর বাকি সময়টা বই। রান্নার পাট অফিসের পিওনের হাতে ; সেরে-সুরে সরোজের সঙ্গেই অফিসে চলে যায়, আবার সঙ্গেই আসে। একটা ছোকরা চাকর এনেছে বাড়ি থেকে, চলে গেলে বাড়িতে থাকে, তারপর পাশে ত লোক রয়েছেই।

মন্দ লাগছে না একরকম। বাড়ির জন্য মনটা মাঝে মাঝে বিমর্ষ হয়ে পড়ে একটু, কিন্তু উপায়ই বা কি-? এ তবু একটা পরিবারের সঙ্গে এক ছাতের নীচে রয়েছে, জীবনের নিত্য-স্রোতের একটি মৃদু কলধ্বনি নিয়ত এসে কানে পৌঁচচ্ছে, আলাদা হয়ে থাকলে সে ত আরও হ'ত দুঃসহ।

কেটে যায় একরকম, শুধু এক-একদিন বিকাল-বেলাটা বড় কষ্টকর হয়ে উঠে। বর্ষাকাল। সকালে কিম্বা রাত্রে বৃষ্টি নামলে মন্দ লাগে না। সকালে থাকে অফিসের কাজ একটু-আধটু, রাত্রে থাকে বই ; নিজেকে নিয়ে বেশ নিবিড় হয়ে বসা যায়। বিকালে কিছু থাকে না হাতে ; বই পড়বার সময়ই নয়, অফিস থেকে সদ্য ফিরে আর ফাইলের দিকে চাইতেই ইচ্ছা করে না! বৃষ্টি নামলে পাশের বাড়ির কলধ্বনিও যায় লুপ্ত হয়ে ; নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ, নিরুপায় বলে মনে হয় তখন।

দিদিমণির বেড়াল

এখানে আসবার সপ্তাহখানেক পরে একটি বিকালের কথা। দিনটা আবার রবিবার। অফিসটুকুও নেই, একমাত্র নিজেকে নেড়ে-চেড়ে আর কত বৈচিত্র্য আনা যায়? বিকালটির দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়েছিল, আজ বেশ বড় ক'রে একটা চক্কোর দিয়ে আসবে; তারপর রোদটা নরম হয়ে আসতে বেরিয়ে পড়বার জন্য পাঞ্জাবি আর ছড়িটা আলনা থেকে পেড়ে নিতে যাবে, জানলা দিয়ে নজর পড়ল পশ্চিম আকাশে তুমুল সমারোহ! মনটা কেমন যেন অপ্রসন্ন আর বিদ্রোহী হয়ে উঠল—যেন অলক্ষ্যে কার একটা অহেতুক বিরূপতা। সরোজেরও জিদ দাঁড়িয়ে গেল একটা, বেরুবেই।

আর একবার মেঘের দিকে চেয়ে নিয়ে চ্যালেঞ্জ হিসাবেই পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে নিল, তারপর ছাতাটা নিতে যাবে এমন সময় হঠাৎ একটা বেড়াল সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এক দৌড়ে উঠান পেরিয়ে রক ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং চকিতে একটু এদিক-ওদিক দেখেই টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠে গুটিয়ে-সুটিয়ে দরজার দিকে ফিরে বসল।

চমৎকার বেড়ালটি, দেখে মনে হয় কাবুলী, মোটা-সোটা গায়ে সাদা-কালোর বড় বড় ছোপে লম্বা লম্বা চুল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

যেমন নির্ভয়ে এসেছে, বোধ হয় গায়ে হাত বুলাতেও দেবে। হাত বাড়াতে গেছে এমন সময় আর একটি দৃশ্য! একটি বছর দশেকের ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠানে এসে পড়ল এবং চকিতদৃষ্টিতে একবার চারিদিকে দেখে নিয়ে—"তবে রে শয়তানী!"—বলে বেড়ালটির মতনই এক লাফে রক পেরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে তাকে পাঁজিয়ে ধরল, বলল—"এইবার!"

সরোজের সঙ্গে কোন কথা নেই, নিয়ে ঘুরে বেরিয়েই যাচ্ছিল, সরোজ প্রশ্ন করল—"তোমাদের বেড়াল?"

কথা যখন কইল তখন একনাগাড়ে অনেকখানিই কয়ে গেল ছেলেটি—"হ্যাঁ, দিদিমণির বেড়াল। দেখুন না, যত আগলে আগলে রাখছি সবাই মিলে—আপনি নোতুন ভাড়াটে, জ্বালাতন করবে ত—তা ক্রমাগত পালিয়ে আসবার ফিকির। কেন জানেন ত? এ বাড়িতে কাকীমার কাছে বড় আস্কারা পেত যে! আপনার আগে ওঁরাই ছিলেন ত, মহেন্দ্র কাকা, কাকীমা, টুনী আর সতু—খুব ভাব ছিল ওঁদের সঙ্গে, টুনীর সঙ্গে আমার আরও ভাব ছিল।"

জানাই, তবু প্রশ্ন করল সরোজ—"তোমাদের এই পাশের বাড়ি?"

কেন যে অদ্ভুত লাগল প্রশ্নটা, ছেলেটি একটু হেসেই মুখের ওপর চোখ তুলে উত্তর দিল—"তবে আর কোন্ বাড়ি হবে ?"

তারপর বাইরের দিকে ত্রস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল—"যাই, বৃষ্টি এলো বলে।...চল্।"

বুকে চেপে আবার ঘুরতেই সরোজ পিঠে হাত দিয়ে রুখে দিল, বলল—"পাশের বাড়ি যখন, তখন আর ভাবনা কিসের ? থাকো না একটু।"

কথা দিয়েই আটকে রাখবার জন্যে বলল—"দরকার কি তোমাদের শয়তানীকে আটকে রাখার ? আসতে দিও ; আমিও বেড়াল খুব ভালবাসি ; জ্বালাতন হব না।"

"ভয়ঙ্কর চোর, আপনি জানেন না তাই ! উপোস করিয়ে মারবে। দুধ, মাছ যেখানে রাখুন, খুঁজে বের করবেই।...শেকল খুলতে যায় ! দিশী বেড়াল নয় ত। কত রকম ফন্দি জানে ! শুধু দিদিমণির আদরের। আমরা সবাই ত শয়তানী নাম রেখেছি।"

বলার ভঙ্গিতে সরোজ একটু হেসে ফেলল, বলল—"তা হোক গে, সাবধান থাকব। তোমাদেরও ত উপোস করিয়ে রাখছে না রোজ। আর তুমিও আস না কেন ?—কে কে আছে তোমাদের বাড়িতে ?"

"আছি আমি, বাবা, মা, দিদিমণি—দিদিমণি কিন্তু..."

হঠাৎ বড় বড় ফোঁটায় ছড়-ছড় করে বৃষ্টি নামল। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের ওদিক থেকে একটি মিষ্টি গলায়—

"খোকা ! পেলে বেড়ালটাকে ? তা'হলে চলে এসো, বিষ্টি নামল যে, হুঁশ নেই ?"

খোকা বেড়ালটাকে আবার বুকে চেপে ধরে বলল—"যাই এখন।"

"আবার আসবে।"

"আচ্ছা।"—রক থেকে ঘুরে বলল খোকা।

"বেড়ালটাকেও আটকিয়ো না আর।"

দোরের কাছে চলে গেছে, একটা সুবিধা হ'ল যে কথাটা বেশ চেঁচিয়েই বলতে হ'ল সরোজকে ; দেয়ালের এ দিকেই থেকে যাবে না।

"ভয়ানক চোর কিন্তু, তা বলে দিচ্ছি।" মুখ ফিরিয়ে আর একবার সাবধান করে দিয়ে বেরিয়ে গেল খোকা।

দিদিমণির বেড়াল

বৃষ্টি বেশ জোরেই নামল। নামুক যত জোরে পারে। যতক্ষণ পারে, আজ আর সরোজের একা-একা বোধ হচ্ছে না।

দু'টো দিন আবার শয়তানীর দেখা নেই। খোকারও নয়। এক-একবার মনে হয় চাকরটাকে পাঠিয়ে ডেকে নেয়। কিন্তু মাঝখানে দিদিমণির বেড়াল থেকে কি একটা যে হয়েছে, এত সহজ একটা ব্যাপারেও অলঙ্ঘ্য সঙ্কোচ এসে যায়, হয়ে ওঠে না। সর্বদা যে ঐ দিকেই মনটা পড়ে রয়েছে এমনও নয়, কাজ, অফিস, বিকালে একটু বেড়িয়ে আসে, রাত্রে বই—বাঁধা রুটিন ধরে দিন যাচ্ছিল কেটে। তৃতীয় দিন বিকালে আবার আকাশটা যেন বিরূপ হয়ে উঠল। বেশি নয়, মনে হ'ল যেন পরিষ্কারই হয়ে যাবে, কিন্তু তিনদিন আগেকার স্মৃতিটিকে হঠাৎ এত স্পষ্ট করে দিল যে, সরোজ বেশ একটু দোমনা হয়ে পড়ল।··· ডেকেই পাঠাবে না কি ছেলেটিকে? ক্ষতিটা কি? আসে না, ছেলেমানুষের একটা স্বাভাবিক কুণ্ঠা রয়েছে, সেটা ত কাটিয়ে দেওয়াই উচিত, তবু যা'হোক একজন কথা কওয়ার সঙ্গী পাওয়া যায়, এই রকম বাদুলে দিনে। আর, এক বাড়িতেই রয়েছে, অথচ শুধু ভাড়া ঠিক করা নিয়ে সেই যে কর্তার সঙ্গে একবার কথা হয়েছিল, তারপর পরিবারটির সঙ্গে বরাবর একটা অপরিচয়ের বাধা থেকে যাবে, এটাও কেমন যেন বোধ হ'তে লাগল সরোজের। একটু অগ্র-পশ্চাৎ করল, তারপর চাকরটাকে পাঠিয়ে দিল খোকাকে ডেকে আনতে, বলবে একটু কাজ আছে।

পাঠিয়ে একটু উৎকর্ণই হয়ে রইল। একটু পরে সেদিনকার সেই কণ্ঠের আওয়াজ—"খোকা তুমি কোথায়?"

ওদিকে কোথা থেকে উত্তর এল—"এই যে!"

"এদিকে এসো!"

এর পর বেশ একটু চাপা গলাই। সরোজ নেহাত রকে বেরিয়ে দেয়ালের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাই শুনতে পেল।

"নোতুন ভাড়াটেবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন। যাও, কিন্তু জ্বালাতন করবে না। বাবা এলে বলে দোব তা'হলে। আর মেলা বকবে না, বড্ড বাচাল তুমি।"

খোকা যখন এল, সরোজ তখন ঘরের মধ্যেই একটা কাগজ পড়ছে মনোযোগ দিয়ে।

প্রশ্ন করল—"আমায় কাজের জন্যে ডেকেছেন? কি কাজ?"

কাজ আর কি?—হঠাৎ কি রকম মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সরোজের; প্রশ্ন করল—"কি কাজ করতে পার তুমি?"

খোকা কৌতুক-ভরা হাসি-হাসি চোখ দুটো তুলে ধরল, বলল—"বা—রে! ডেকে এখন কি কাজ করতে পারো!"

কথাটা ঘুরিয়ে নিল সরোজ। বলল—"বলছিলাম···আসনি কেন? তুমি ও তোমাদের শয়তানীও?"

খোকা চৌকাঠ টপকে ভেতরে চলে এল; একবার বাইরের দিকে ঘুরে চেয়ে নিয়ে আর এক পা এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল—"বেঁধে রেখেছিল।"

সরোজও মুখটা একটু বাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে প্রশ্ন করল—"তোমায়?"

হেসে ফেলল খোকা। সেই রকম গলায় বলল—"আমায় নয়, শয়তানীকে।"

সরোজও আবার সেই রকম গলায় বলল—"খুলে দিও।"

এরকম মনের মতো পরামর্শ আর এভাবে দেওয়ায়, খোকা খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে; বাইরের দিকে আর একবার দেখে নিয়ে গলাটা আরও নামিয়ে বলল—"দিয়ে এসেছি খুলে। দেখুন না, কোথায় কি আছে একবার ঘরগুলোতে ঘুরে দেখে নেবে, তারপর···"

সরোজের দৃষ্টি অনুকরণ করে উঠানের দিকে চেয়েই—"ঐ এসে গেছে!" বলে আর ফিসফিসিনি নয়; গলা ছেড়েই চেঁচিয়ে উঠল খোকা।

এবার ত তাড়া খেয়ে নয়, লেজটি সোজা করে তুলে শরীর দোলাতে দোলাতে মন্থরগতিতে চলে আসছে শয়তানী, খোকাই লাফিয়ে গিয়ে পাঁজায় করে নিয়ে এল। সরোজের সামনে বাড়িয়ে ধরে বলল—"তুলোর বস্তা। দেখুন না হাত দিয়ে, কিছু বলবে না। কোল-ক্যাংলা, দিদিমণির কোলে-কোলেই ত ঘোরে।"

হাত বাড়িয়ে নিতেই যাচ্ছিল, তারপর হঠাৎ কোথা থেকে একটা সঙ্কোচ এসে পড়ায় বিরত হয়ে পিঠের ওপর হাতটা টেনে দিতে একটা ঘড়-ঘড় শব্দ উঠল শয়তানীর বুকের মধ্যে থেকে। খোকা উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল। শব্দটার নকল করে বলল—"ঘরর্ ঘরর্—ওটা কি জানেন? বলছে—তোমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল, এবার খেতে দাও।"

সরোজ বলল—"নৈলে চুরি করব।"

দু'জনেই হেসে উঠল। এমন সময় ওদিক থেকে আবার সেই কণ্ঠে—

"খোকা! বেড়ালটা আবার পালিয়েছে, কে খুলে দিলে ওকে?"

সরোজ বলল—"বলে এসো এখানেই আছে, আমি নিয়ে আসব।"

নিজেও উঠে পড়ল। রকের ধারে দেয়ালের কাছ থেকে কথাটা বলে যখন ফিরে এল খোকা, দেখে সরোজ একটা ছোট ডেকচি কাত করে দুধ ঢালছে একটা প্লেটে। চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করল—"দুধ দিয়েছেন শয়তানীকে? নিজের খাবার দুধ থেকে?"

"নতুন ভাব হ'ল···নয়তো যদি চুরি করে খায় তখন দুধও থাকবে না, ভাবও থাকবে না, নয় কি?"

শয়তানী অনুমতির অপেক্ষা না করে কোল থেকে নেমে আরম্ভ করে দিয়েছে। খোকা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে। সরোজের কথায় শুধু ঠোঁট কুঁচকে একটু হাসল, তারপরে শয়তানীর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মাথা নীচু করে তার পরিতৃপ্ত আহার লক্ষ্য করে যেতে লাগল।

অভিভূত হয়ে পড়েছে বলেই ভুলে গিয়েছিল, হঠাৎ মনে পড়ে যেতে সেই রকম অন্তরঙ্গতার সুরে বলল—"এক্ষুণি কি শুনে এলুম দেওয়ালের ওদিকে, বলুন ত?"

"তুমি শুনলে, আমি কি করে বলব?"

খোকা আর একটু গলাটা নামিয়ে নিল—

"মা বলছে—থাক না বাপু, ছেলেটি যদি ভালোবাসে বেড়াল, না জ্বালাতন হয় ত তোর অত মাথাব্যথা কেন? ও বলেছে—আমি আর ঢুকতেই দোব না পোড়ারমুখীকে, দেখি, জ্বালাতন হন কিনা।···শুনলাম আমি, হ্যাঁ!"

"ভালোই ত। তোমাকেও না ঢুকতে দেয় তোমার দিদি, আরো ভালো'হয়, আমরা তিনজনে বেশ থাকি, তুমি, আমি আর শয়তানী। কি বলো?"

"উঃ, তা'হলে যা মজা হয়!···"

চাকরটা একটা বিস্কুটের টিন কাটতে কাটতে উপস্থিত হ'ল। খোকা কতকটা উৎফুল্ল, কতকটা বিস্মিত হয়ে উঠল, প্রশ্ন করল—"আবার বিস্কুটও খাবে?"

সরোজ একটা প্লেটে খান আষ্টেক রেখে ওর সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল—"ওকে জিগ্যেস করতে হবে পছন্দ কিনা, তোমায় ত জিগ্যেস করতে হবে না, খাও।"

প্রবল আপত্তি তুলল খোকা, লুব্ধদৃষ্টিতে প্লেটটার দিক থেকে শরীরটাকে একটু পিছিয়ে নিয়ে বলল—"না, কক্ষনো না। আমায় হ্যাংলা বলবে দিদি।"

"তাই জন্মেই ত আরও দিচ্ছি আমি, হ্যাংলা ভাইকেও আর বাড়ি ঢুকতে দেবে না। তিনজনে বেশ থাকব আমরা—আমি, তুমি আর শয়তানী।"

তাই প্রায় দাঁড়াল, যদিও বাড়ি ঢুকতে না দেওয়ার জন্য নয়। আরও দুটো দিন ওদিকে একটু কড়াকড়ি চলল, তারপর যেন এলে গিয়ে রাশ ঢিলে দিয়ে দিল। খোকার তবুও ইস্কুল আছে, তার জন্য পড়াশুনা আছে, শয়তানী ত একেবারে এ-বাড়ির বেড়াল হয়ে গেল। অবশ্য অমনি নয়—আলাদা দুধের ব্যবস্থা হয়েছে, একসঙ্গে ঘন করে জ্বাল দেওয়া। মাছ ত আছেই, মুড়ো থাকলে সেটা শয়তানীর; যদি বাজারেই কোনদিন মাছ না রইল ত চাকরটাকে পাশের ডোবা থেকে পুঁটুলে ছিপে ধরতে হয় গোটাকতক শয়তানীর জন্য। চা বিস্কুট দু'বেলা।

খোকা চোখ বড় বড় করে—"উস!" ক'রে একটা ঝোলটানা গোছের শব্দ ক'রে বলে—"এত আদর, চা-বিস্কুট! কাকীমার কাছেও এত আদর পাননি কখনও, দিদিমণির কাছেও নয়!"

বেড়ালটাকে মাঝে রেখে দু'বাড়ির মধ্যে অন্য দিক দিয়েও আড়ষ্ট ভাবটা অনেকখানি কেটে এসেছে। মন্তব্য হয় মাঝে মাঝে, এ দিকে পৌছায়, ওদিকেও নিশ্চয়ই পৌঁছে দেয় খোকা, একটা সূক্ষ্ম আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে বাড়ির দুটো অংশ যেন আস্তে আস্তে এক হয়ে আসছে।

সরোজ প্রসঙ্গটা থামতে দেয় না, বলে—"এমন আর কি আদর দেখলে, একটা পোষা বেড়াল···"

খোকা চোখ দুটো কপালে তুলে বলে—"চা-বিস্কুট। বাস রে!···নবাব একেবারে শয়তানী!···বাদশাজাদী।"

গলাটা খাটো করে নিয়ে মাথাটা দুলিয়ে ফিসফিস করে বলে—"কে বলে জানেন, বাদশাজাদী?"

সরোজ স্বর অনুকরণ করে আন্দাজটা ইচ্ছা করেই উল্টে দিয়ে বলে—"মা নিশ্চয়।"

"বয়ে গেছে মার।"

তারপর এমন রূঢ় মন্তব্য কে করতে পারবে, ঠোঁটের কোণে একটু হাসিতে,

চোখের একটু ইশারায় সে সম্বন্ধে যেন মন-জানাজানি হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে এইভাবে প্রশ্ন করে—"আর কি বলে বলুন ত ?"

"কি করে বলব ?"—সকৌতুক হাসির মধ্যে দিয়ে বলে সবোজ।

বলে—"বোকাকে ঠকিয়ে খেয়ে নিতে দে খুব।···বলবেন না কাউকে যেন।"

সরোজ বলে—"অত বোকামি করি ?···বোকাকে নিয়ে আর কিছু কথা হয় নাকি ?—ভালো-মন্দ ?"

"ভালো! সেই পাত্তোর কিনা! নাক সিঁটকেই আছে ত।"

"তবু···"

একবাব বাইরের দিকে চেয়ে নেয় খোকা, যাব প্রসঙ্গ চলছে বোধ হয় তাব মতো করেই নাকটা সিঁটকে নেয়, বলে—"ম্যাগগো! বেটাছেলে কোথায় ভালো একটা কুকুর পুষবে—ঝাঁউ-ঝাউ করে বাড়ি মাতিয়ে ডাকবে, না, মেয়েদের মতন মেনী বেড়াল কোলে···মিউ-মিউ-মিউ।···দু'চক্ষের বিষ!"

আড়াআড়িটাও কম উপভোগ্য হয়ে ওঠে না, বিকেলে অফিস থেকে উঠানে পা দিযেই সবোজ হাঁক দেয়—"খোকা, শয়তানীকে নিযে এসো, চা-বিস্কুট খাওরাব সময হয়ে গেছে ওব।"

—নিশ্চয়, একজনের মুখটা কুঞ্চিত হযে উঠল ; সরোজ একটা দুষ্টু হাসি ঠোঁটে করে বোধ হয় দেযালেব দিকে একটু কান পেতেই আস্তে আস্তে গিয়ে ঘরে ওঠে।

অন্য দিকও আছে। ও-বাড়ি থেকে তবকারিটা আসটা আসছেই দু'বেলা। একটা নতুন কিছু হ'ল ত তাও। নতুন কিছু করবার জন্য কি তাগিদও জাগছে দেওয়ালেব ওদিকে কারুর মনে ?

প্রতিদানে এদিক থেকে কি দেওয়া যায় ?

সরোজ প্রশ্ন করে—"খোকা···ইয়ে, বলছিলাম—মা বই-টই পড়েন নাকি ?"

খোকা একটু মাথা দুলিয়ে বলে—"পড়েন। এখন মহাভারত পড়ছেন।"

এর পর আসল উদ্দেশ্যটা কি করে প্রকাশ করা যায়, এই চিন্তা করছে সরোজ ; খোকা দিদির কথা তুললে যেন গলা খাটো করে নেয়, সেইভাবে বলল—"দিদি জিজ্ঞেস করছিল—খোকা নতুন ভাড়াটে, তোমার সরোজদা' বই-টই পড়েন না ?"

"তুমি কি বললে ?"—একটা অবলম্বন পেয়ে খুব আগ্রহের সঙ্গেই প্রশ্নটা করল সরোজ।

"বললাম, পড়েন ইংরিজী বই, শুনে সেই রকম নাক সিঁটকোয়—ম্যাগগো ! বেড়াল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তাঁর আবার ইংরিজী বই না হলে চলবে না। কত দেখব !"

এমনভাবে নাকটা কুঁচকে নকল করে বলে যে, বিদ্রূপ মন্তব্য হলেও একটু হেসে উঠতে হয় সরোজকে। তারপর বলে—"কেন, তুমি আমায় বাংলা বই পড়তে দেখোনি ?—দেখোনি নিশ্চয় ; বাংলাই বেশী পড়ি আমি, অনেক রাত পর্যন্ত।"

লাইব্রেরীর গ্রাহক হয়েছে। পড়ার শখ আছে, সুতরাং কিছু আনিয়েও নিয়েছে বাংলা বই।

বই মাঝে ক'রে দু' বাড়ির, কিম্বা আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে দু'জনের সম্বন্ধটা আরও নিবিড় হয়ে উঠছে।

কিন্তু ওদিককার ভাবটা সত্যই কি তাই ? কেমন একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ ওঠে মনে, খোকা যখন নাক তুলে ওদিককার মতটা জানায়—"খোকা নতুন ভাড়াটে তোমার সরোজদার সব ভালো ; শুধু বেড়াল ঘাঁটাটা ছাড়তে বোল দিকিনি।...ম্যাগগো ! ব্যাটাছেলে হয়ে পারেন কি করে ? আমারই গা ঘিন-ঘিন করে।"

দোমনা হয় এক-একবার। আবার মনকে প্রবোধ দেয়—ওটা নিশ্চয়ই মনের কথা নয়, একটা ভান মেয়েছেলের। যেটা সবচেয়ে বেশী চায় সেইটে নিয়েই সবচেয়ে বেশী নাক সিঁটকোয়,' না ?—

তা ভিন্ন শয়তানীকে নিয়েই ত সব ; এমনই কী চমৎকারটি, তার ওপর একজনের ভালোবাসায়ই ভালোবেসে ফেলেছে সরোজ : সে মুখে যাই বলুক না কেন। ছাড়ে কি করে ?

মুড়ো খাওয়ায়, ঘন দুধ, চা-বিস্কুট। বুকে চেপে চেপে ধরে। খোকার সামনেই। চলুক ত তারপর একদিন এর ফয়সালা হয়েই যাবে।

মাসখানেক কেটে গেল। দু'দিন নিমন্ত্রণও খেয়ে এল সরোজ। মা বসে খাওয়ালেন, পরিবেশন করল মেয়ে।

দিদিমণির বেড়াল

তারপর একদিন ফয়সালাটাও হঠাৎ হয়ে গেল—

একটা ফটো নিচ্ছিল সরোজ। কোথায় একটা বাধা রয়েছে বলে আরও যেন ভালোবেসে ফেলেছে বেড়ালটাকে। দুধের প্লেটের সামনে বসিয়ে একটা পোজ নিয়েছে, আর একটার যোগাড় করছে, খোকা এসে উপস্থিত হ'ল।

"ফটো নিচ্ছ সরোজদা? শয়তানীর?" উল্লাসে হাততালি দিয়ে উঠল।

সরোজ গোটা দুই পোজ তুলে বলল—"এবার তুমি বোস চেয়ারটাতে শয়তানীকে কোলে নিয়ে। বেশ চমৎকার হবে!"

ঠিকঠাক করে দু'তিন রকমে বসিয়ে ফটো তোলা হয়ে গেলে খোকা একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

"এবার দিদিমণির কোলে দিয়ে একটা···হ্যাঁ সরোজদা'—নিশ্চয়ই তুলতে হবে—কোন মতেই শুনব না আমি—কোন মতেই না—তুলতেই হবে···"

প্রবল বেগে মাথা দোলাতে লাগল, কোন আপত্তিই শুনবে না।

আপত্তি তেমন কিছু করেনি সরোজ, শুধু কিসের ঘোরে যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। একটু হেসে বলল—"সে কি করে হবে?···ইয়ে, তোমার মা রাজী হবেন?"

"হবেন না! ইশ!—দেখো মার ফটোও তোলাব, শয়তানীকে কোলে করে···!"

ঘোরটা যেন কেটেও কাটতে চাইছে না।···আশা, না দুরাশা?

সরোজ কতকটা দুরাশার নিরুৎসাহ কণ্ঠেই বলল—"তা বেশ, জিজ্ঞেস কর মাকে।"

দেরি সয় আর? খোকা কয়েকটা লাফে বেরিয়ে গেল। সরোজ এগিয়ে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। একটু পরে হাততালি দিতে দিতে ছুটে এল খোকা—"রাজী!—রাজী!—রাজী!—রাজী!—রাজী!—রাজী!···"

শুনেছে সরোজ, শুধু যার ফটো তার মুখের দুটো উল্লসিত কথা শুনতে পাবে ভেবেছিল।···সে নিশ্চয়ই আরশির সামনে দাঁড়িয়ে পরখ করে দেখছে, কি পোজে ফটোটা তুললে কি রকম দেখতে হবে।

আনন্দ-নট

এ ক্যামেরাটা বড় ছোট ; ইঞ্চি দুয়েকের একটা ফটো ওঠে। ভালো ক্যামেরাটা বাড়িতে আছে। তা হোক, আর কি খরচের কথা ভাবা যায় ? সন্ধ্যার সময়ই বাজারে গিয়ে একটা বেশ ভালো দেখে ক্যামেরা কিনে নিয়ে এল সরোজ।…থাক, একটা বিশেষ প্রয়োজনে একটা বিশেষ দিনে কেনা হয়েছিল ; জীবনের একটা বিশেষ সঞ্চয়।

"একটা ভালো ক্যামেরা কিনে আনলাম খোকা, ওটা বড্ড এতটুকু ত… তোলা হবে কবে ?"

দু'বাড়িতে একটা যেন সব জানাজানি হয়ে যাচ্ছে কি করে ; নূতন ক্যামেরার কথাটা বলতে আজ আর মোটেই সঙ্কোচ হ'ল না সরোজের।… কবে ? খোকা ত এখনি হলে আর অন্য দিন চায় না। কিন্তু তা ত আর সম্ভব নয়।

তবে দেরিও হ'ল না। পরদিন সকালেই খোকা এসে হাজির, উঠে প্রথমেই তার সঙ্গে দেখা, সেই তুলল জোরে ধাক্কা দিয়ে। কি করবে, কি বলবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না—

"ও সরোজদা—কী পয়মন্ত যে তোমার ক্যামেরা কি বলব। তোল না— কত ফটো তুলবে, কালই টেলিগ্রাম এসে গেছে—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ত আমি— আজই…এক্ষুণি"…টানা হর্ণ দিয়ে দোরগোড়ায় একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াবার শব্দ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল খোকা…"ঐঃ, বললাম না—ট্যাক্সি এসে গেল দিদিমণির ভোঁ—ও—ও—ও।"…

শব্দটা মুখে ক'রে হাততালি দিতে দিতে তিন লাফে উঠোন ডিঙিয়ে চলে গেল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত স্বপ্ন নিয়ে জেগে থাকা, ঘুমের জড়িমা এখনও লেগে রয়েছে সরোজের চোখে—ঠিক যেন বোঝা যাচ্ছে না কিছু।

শয়তানী ল্যাজের পতাকা তুলে প্রাতঃকালীন চা খেতে উঠানে এসে ঢুকল।

তারপরেই খোকার সঙ্গে খোকার চেয়েও হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন শয়তানীর মনিব খোকাদের দিদিমণি—

"তুই পোড়ারমুখী এখানে !…আয় এদিকে…শুনলাম ভাই তোমার কথা—কী বলে আশীর্বাদ করি ? আমি যেখানেই যাই এক ভাবনা—এ করে তীর্থিধর্ম

হব ?—দু'চক্ষে দেখতে পাবে না শৈলীটা, কী হ্যানস্তা যে হচ্ছে আমার সুনুব—নামই রেখেছে শয়তানী…এসেই শুনলাম তোমার কথা…নেই তীর্থি-মাহাত্ম্যি ?"—

গবদেব থানপরা, প্রয়াগ থেকে নিশ্চয় সত্য মাথা মুড়িয়ে এসেছেন সত্য পুণ্য অর্জন ক'রে।

আব মনে হচ্ছে যেন সমস্ত পুণ্য উজাড় ক'বে ঢেলে দিচ্ছেন সরোজের মাথায়।

কেউ বাকি নেই

ছোট একটি শিশুর অভিশাপে সবার কীর্তি একে একে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

অভিশাপ বইকি। কি এমন অপরাধ যার ঐরকম সাজা, যার জন্য চার বছরের একটা ছেলেকে অমন চীৎকার করতে করতে ছুটে বেরিয়ে আসতে হ'ল বাড়ির ভেতর থেকে? হ'তে পারে দাদু এসেছে বলে চীৎকারের আরও বাড়াবাড়ি, তবু, বাদসাদ দিলেও যা বাকি থাকে সেটাকেও ত অগ্রাহ্য করা যায় না। এত কিসের রাগ? একে রাগ বলতে হবে, না, চণ্ডাল?

দাদু বাইরের ঘরে ইজি-চেয়ারে বসে সকাল বেলার চা খাচ্ছিলেন, এক হাতে খবরের কাগজ, "কি হ'ল?"—বলে হন্তদন্ত হয়ে উঠে এগিয়ে এলেন, তাড়াতাড়িতে খানিকটা চা ছল্‌কে কাগজের ওপর পড়েও গেল। ততক্ষণে মেয়েও এসেছে বেরিয়ে। শ্বশুরবাড়ি, একেবারে বাড়ির মত অত বেপরোয়া না হলেও, বেশ খানিকটা অসংযতই। মাথা থেকে আঁচলটা অনেকখানি নেমে এসেছে, আলগা খোঁপাটা পড়বে ভেঙে, হাতটা তখনও উঁচানো। গলাটা চাপা হলেও বেশ কর্কশ—

"আজ তোকে আর আস্ত রাখব না হতভাগা! তুই যাবি কোথায় পালিয়ে আমার কাছ থেকে?"

বাপ নাতিকে দু'হাতে কোলে চেপে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন—

"কি হয়েছে?"

"চুরি করে পালিয়ে এসেছে; এখনও ওর হাত দেখো, মুখ দেখো…"

নাতি চীৎকারের মধ্যেই মুখটা দাদুর জামায় ভাল করে ঘষে নিয়ে ওপর দিকে তুলে ধরে বলল—"আমি ঠায় নি…কৈ?"

দাদু মেয়ের দিকেই কড়া চোখে চেয়ে বললেন—"মানলুম খেয়েছে। তাই বলে মেরে ফেলতে হবে?"

বাপের সঙ্গে বাপের বাড়ির আবহাওয়াও খানিকটা এসে গেছে, মেয়ে রাগটাকে আরও মুক্তি দিয়েই বলল—"হ্যাঁ, মেরেই ফেলব ওকে আমি। শাশুড়ী

তোমার জন্যে সেই কোথা থেকে ভাল মনোহরা সন্দেশ আনিয়ে রেখেছেন—এখানে কিছু পাওয়া যায় না—তা কখন কি করে সন্ধান পেয়ে তার আদ্দেকগুলো সাবড়ে ফেলেছে। ওকেও আমি শেষ করব, তবে আমার নাম—কতক্ষণ আগলে রাখবে তুমি ?…"

রাগের মাথায় রাগ বেড়েই যায়। "আয় হতভাগা!" বলে এক পা এগিয়ে আসতে বাপও উঠলেন একেবারে জ্বলে। নাতিকে সামনে চেপে ধরে কুটুমবাড়ির কথা খানিকটা ভুলেই ধমক দিয়ে উঠলেন—"তা নে, আগলাব না, মেরে ফেল। ওঁদের টানে আসা, সেটা বন্ধ হোক এবার।…ছেলে দুটো সন্দেশ খেয়েছে—কান্নার চোটে এক কণা পেটে গেছে কি না-গেছে, তার জন্য তাকে শেষ ক'রে ফেলতে হবে!…মা!…বেশ করেছে চুরি করেছে। আরও করবে, এখানে না সুবিধে হয় সেখানে গিয়ে করবে, আজই নিয়ে যাচ্ছি। করবে চুরি; করবার বয়েস।…তুই তোর বয়েসে করিসনি চুরি ?…"

হঠাৎ যেন কোথা দিয়ে কি হয়ে গিয়ে মেয়ে বাপের মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল,—যেন বিশ্বাস করতে পারছে না যা শুনল। বাপেরও হুঁশ হ'ল—যে বয়সে করত চুরি, মেয়ে আর সে বয়সে নেই, সে জায়গাতেও যে নেই সেটাও বসেছে ভুলে।…একটু যেন গলাটা শুকিয়ে কথা গেল আটকে—কয়েক সেকেণ্ড, তারপরেই সামলে নিলেন, নিজেকেই টেনে নিয়ে এসে বললেন—"কেন তোর বাপ চুরি করে নি?…ছেলেবেলার রোগ—ও রোগ দেখতে গেলে কার না…"

মেয়ে হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তার সঙ্গেই আপসানি—

"তাই নিয়ে যাও…আমি ও হতভাগার মুখ দেখব না…ওর জন্যে আমায় বুড়োবয়সে বাপ-তোলানি শুনতে হ'ল…কি বাকি রইল আর আমার?…কিছু বলব না, কোন সম্বন্ধ নেই ওর সঙ্গে আমার আর…যা কখনও শুনতে হয়নি আমার কারুর কাছে…"

বাপ এগিয়ে গিয়ে মাথাটা বুকে টেনে নিলেন। বললেন—"এই দেখো ছেলেমানষী! তা তোর বাপই ত তোকে বাপ তুলিয়েছে, না আর কেউ? চুপ কর। দেখো, তবু কাঁদে! বলছিলুম—ছেলেবেলায় কে কবে চুরি করেছে তার জন্যে ত সারাজন্ম চোর হয়েই থাকচে না।—চুপ কর মা…মালা শুনছিস?

"...শাশুড়ী-টাশুড়ী কেউ এসে পড়বে, মনে করবে—কি না কি বলেছে মেয়েকে..."

নিজের গলাও কি করে যেন ধরে আসে। মেয়ের মাথাটা বুকে চেপে চেপে ধরেন দীননাথ।

দীননাথের চুরির কথা নিয়ে এখনও আলোচনা হয় বাড়িতে। তার একটা কারণ হয় ত এই যে, মা, বড় বোন এখনও বেঁচে; তবে একথাও ঠিক যে চুরি করায় যে সব প্রতিভার পরিচয় দিতেন দীননাথ তা যেমন মৌলিক তেমনি অসাধারণ, মুখে মুখে পারিবারিক ইতিহাসে বাঁচিয়ে রাখবারই জিনিস। উদাহরণ স্বরূপ লুচি-পায়েসের গল্পটা নেওয়া যেতে পারে। বিকেলে জলখাবারের জন্য কোন পূজা-পর্ব উপলক্ষে সেদিন ছিল বিশেষ বন্দোবস্ত। গরমকাল, ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখলে পায়েস যাবে টকে, লুচিও না টকুক, ভেপসে যেতে পারে। হাওয়ায় আদুড় রেখে দেওয়া দরকার।

কিন্তু তাতে বিপদ আছে। দীনুর লুব্ধ দৃষ্টি; একটু নাগালের মধ্যে পেলে আর রক্ষা নেই।

ছোট-বড় ছেলেমেয়েদের মিলিয়ে চারজনের যোগ্য খাবার। বিকেল বেলা দেওয়া হবে সবাইকে। রান্নাঘরের জানলা থেকে প্রায় হাত চারেক দূরে একটা টেবিলের ওপর লুচির রেকাবি আর পায়েসের বাটি রেখে দিয়ে গেরস্ত দোরে তালা লাগিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খেয়েদেয়ে আরাম করতে গেল।

খান-বারো লুচি, এক বাটি সুজির পায়েস। বিকালে ঘরের তালা খুলে দেখা গেল তিনখানি লুচি আর বাটির কোলে ছটাকখানেক পায়েস পড়ে আছে। আরও আশ্চর্য—যেন উধাও হয়ে গেছে, কোন্ দিক দিয়ে কিভাবে গেল তার কোন চিহ্ন রেখে যায় নি।

একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। কাজটা যে দীনুর তাতে কারুর সন্দেহ নেই, কিন্তু ধরা-ছোঁওয়া ত যাচ্ছে না। সমস্ত হাতটা জানলা দিয়ে সাঁদ করিয়ে দিলেও তবু ত হাত দুয়েক দূরেই থেকে যায়। লাঠি দিয়ে কিম্বা আঁকশি ক'রে টেনে আনার প্রশ্নই ওঠে না। তা'হলে?

দীনু ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে—"মারো দীনেকে ধরে—একে

ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে—ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো দীনেই ত—বেড়ালে থাক, কুকুরে থাক, ধর্ তেড়ে দীনেকে···”

বেড়ালে লুচি খাবে না। টেবিলের মাঝখানে কি আছে টের পেয়ে যদি পায়েস খায়ই ত ছড়ানো-লেপানো থাকবে।

টের পাওয়া গেল—নেহাত নাকি ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, তাই। একটি হাত আড়াইয়েক লম্বা চাঁচাড়ি, প্রায় আধা-আধি পর্যন্ত দু'ফাঁক করে চেরা। শেষের দিকে একটি ছোট্ট গোঁজ লাগানো রয়েছে, যাতে চিমটের মত চেরা, মুখটা হয়ে রয়েছে ফাঁক। কাঠিটা দীনুদের পড়বার ঘরের এককোণে দাঁড় করানো রয়েছে, যেখানটায় দীনুর পড়বার টেবিল।

তবুও কি অত খেয়াল হ'ত কারুর ? পিসীমা ঘরে কি করতে গিয়ে দেখেন একটা চেরা চাঁচাড়ি, তার মুখে বাঙা ক্ষুদে ক্ষুদে পিঁপড়ের ডাঁই। কি রকম কৌতুহল হতে তুলে নিয়ে নাড়া দিতেই মনে হ'ল ভেতরটা যেন সাদা সাদা কি মাখানো, হাত দিতেই টের পাওয়া গেল পায়েস! শুকিয়ে গেছে, কিন্তু বুঝতে ভুল হয় না। তবু কি স্বীকার করবে ? পিসীমা বলেন—“এ তোরই কাজ। ঐ চাঁচাড়ি চিমটের মতন করে দূর থেকে লুচির গোছার মধ্যে সাদ করিয়েছিস, গোঁজটা টেনে নিতেই খামচে ধরেচে লুচির গোছাকে, তারপর সেই চাঁচাড়ি সুদ্ধু লুচি পায়েসে উলটে-পালটে নিয়ে বের করে করে খেয়েছিস—একবারে নয়—সবাই ঘুমুচ্ছে, সকাল সকাল ছুটি হয়েছে, তুই নিশ্চিন্দি হয়ে এই কর্ম করেছিস।···ছিটে-ফোঁটা যা এদিক ওদিকে পড়েছে, কাটিতে ন্যাকড়া জড়িয়ে মুছে নিয়েছিস। ব্যস, আর টের পাওয়াব ত লোক নেই!···এ ছেলে বড় হলে কি হবে গো!”

—এই রকম আরও সব কীর্তি। এখনও আলোচনা হয় সবাই একত্র হয়ে বসলে। ছেলেমেয়েদের ঠাট্টার সম্বন্ধ, বলে—“দিদিমণি—মানে তোমার পিসশাশুড়ীও তা'হলে নিশ্চয় কম ছিলেন না মা। পাকা চোরেই গোয়েন্দা হতে পারে, সব আঁৎঘাৎ থাকে ত জানা···”

মা চুপ করে গিয়ে কি যেন একটু ভেবে নেন, তারপর হাসিমুখেই একটু রাগের ভাব দেখিয়ে বলেন—“হ্যাঁ, অমনি তোমাদের কাছে চোর হয়ে গেলেন তিনি!··· বললুম ত, ছেলেবেলায় অমন একটু-আধটু দোষ কার না থাকে ?···শুনি তাঁরাও নাকি দুই ভাই-বোনে মিলে···থাক বাপু, গুরুজন, স্বর্গে গেছেন, তাঁদের টেনে

এনে আর ব্যাখ্যানা করে কাজ নেই। ওঠো সব তোমরা। মস্ত বড় সাধু এক-একজন!"

বেহান, অর্থাৎ মেয়ের শাশুড়ী সুরধুনী—বড় আমুদে মানুষ। আমোদের সন্ধান পেলেন ত তার শেষ রসটুকু পর্যন্ত নিঙড়ে নিয়ে তবে ছাড়েন। সেদিন রাত্রেই সভ্য সভ্য একটু হয়ে গেল।

স্বামী আর বেহাইকে বসে খাওয়াচ্ছেন। বধূও রয়েছে, ফরমাশ মত এনে দিচ্ছে। শেষের দিকে পায়েস এলে হঠাৎ একটু বেশী জিদ ধরে বসলেন—

"না বেহাই আর দু'খানা লুচি দিক, আরও একটু পায়েস। তুমি যাও বৌমা, নিয়ে এস, আমি শুনব না।...ওরা রাবড়ি করতে চেয়েছিল, তার সঙ্গে ঘি-ভাত, আমিই জোর করে বললুম—না, লুচি আর সুজির পায়েস বড় পেয়ারের জিনিস বেহাইয়ের আমার...আমি জানি এর জন্যে কত..."

খুব আমুদে লোক যেমন হয়ে থাকে—খুব হালকা, বলতে বলতেই হেসে দুলে উঠে ঘাড়টা ফিরিয়ে নিলেন। দীননাথও একবার চোখ তুলে দেখে নিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন, মেয়ে মালতী পায়েস নিয়ে আসছিল, হঠাৎ একটু যেন জড়োসড়ো হয়ে তাড়াতাড়ি আবার ফিরে গেল রান্নাঘরে। শ্বশুর প্রিয়নাথ ভেতরকার কথাটা জানেন না, বললেন—"কি হ'ল আবার।...মিছে হাসির রোগটা আপনার বেহানের সারাতে পারেন বেহাই? আমার দ্বারা ত হ'ল না..."

রাত্রে মেয়ে যখন মশারি গুঁজে দিতে এল, দীননাথ বলল—"হ্যাঁ রে মালা, তুই বেহানের কাছে কীর্তি সব ফাঁস করে দিয়েছিস, ওঁর ত জানবার কথা নয় সে-সব।"

মেয়ে মুখটা গোঁজ করে বসল বাপের শিয়রের কাছে। এমনিই অভিমানী, তার ওপর অনেকদিন পরে বাপকে পেয়ে এবং আরও যা যা হয়েছে তাতে অভিমানটা আরও গেছে বেড়ে; চোখ দুটি ছলছল করে উঠল, মুখখানি আরও ভারী হয়ে উঠল—অভিমান, তার সঙ্গে খানিকটা যেন রাগও। রাগ কিংবা আক্রোশ। বাপ চেনেন ত, সামলে নেওয়ার জন্যে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন —"তা বলেছিস ত বলেছিস, তাতে হয়েছে কি? আমুদে লোক, খানিকটা ফুর্তির খোরাক পেলেন বেহান তোর বাপের ঘাড় দিয়ে।"

কেউ বাকি নেই

মেয়ের ঠোঁট দুটি ফুলে উঠল—

"আমি ইচ্ছে করে বলেছি নাকি বাবা?—সেই পাত্তোর আমি!···সমানে তুমি যখন বকছিলে আমায়, নিজের মুখেই ত বললে, উনি এদিক দিয়েই যাচ্ছিলেন, দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলেন আড়াল থেকে, তারপর আর রক্ষে আছে?—হ্যাঁগা বৌমা, কি চুরির কথা বলছিলেন বেহাই। আমায় বলতে হবে বাপু।···আমিও বলব না, উনিও ছাড়বেন না, শেষকালে একেবারে দিব্যি দিয়ে বসলেন। তখন কি করি বলো?"

"তা বলছি ত, বেশ করেছিস বলেছিস, তার জন্যে দুঃখ কি এত?"

"তুমি ত বলছ দুঃখু কি, কিন্তু অন্যায় নয়? মাথার দিব্যি দিয়ে বাপ কবে কি করেছেন সে-সব বের করে নেওয়া! তা আমিও ছাড়ছি না···"

হঠাৎ মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। দীননাথ একটু শঙ্কিতই হয়ে উঠলেন, বললেন—"তা বলে ঝগড়া করবি নাকি? খবরদার!"

"ঝগড়া করতে গেলুম কেন?"

উঠে ভেতরে দরজার কাছে চলে গেল, একটু ফাঁক করে গলা বাড়িয়ে দেখে নিয়ে আবার ফিরে এসে বলল—"ঝগড়া কেন, যেমন তোমার কথা বলিয়ে নিয়েছেন, তেমনি ওঁর কথাও ফাঁস করে দিচ্ছি, রোস না।"

"চুরি করে খান?"—হঠাৎ কৌতুকে মুখটা দীপ্ত হয়ে উঠেছে দীননাথের।

"আহা খান নি যেন! তবে আজকাল কি? ঐ তোমার মত বয়সে। নতুন কনে-বৌ হয়ে এসেছেন, তখন ত একেবারে ছেলেবেলায় বিয়ে হ'ত—এগার বছরের কনে-বৌ···অবিশ্যি ক্ষীরও নয়, সন্দেশ রসগোল্লাও নয়—"

দ্বিধাভরে চুপ করে যেতে দীননাথ তাগাদা দিলেন—"তবে?"

"দক্ষিণের মেয়ে ত শাশুড়ী—নোনা ইলিশের দেশের—ইদিকে ত অত রেওয়াজ নেই—একবার কি করে এসেছে বাড়িতে, ব্যস্, আর কি নোলা সামলানো যায়?"

"চুরি?"—কৌতূহলটা আর সামলাতে পারছেন না দীননাথ।

"চুরি নয় ত কি? তবে নিজের হাতে কি? অমন ভোলানাথ শ্বশুর কি করতে রয়েছেন! তাঁকে দিয়ে রাত দুপুরে রান্নাঘর থেকে···"

বাড়ির ওদিক থেকে ননদ হাঁক দিল—"বৌদি, হয়ে থাকে ত এস, ছেলে উঠেছে!"

দীননাথও সন্ত সন্ত শোধটা নিলেন।

পরদিন দুপুরে আহারের সময়। থালা-বাটির ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন—"এবেলাও দেখছি লুচি পায়েস বাদ যায় নি। কি বলে যে ধন্যবাদ দোব বেহানকে ভেবে উঠতে পারছি না। কিন্তু আর একটা জিনিস যে আমার আরও পেয়ারের সেটার সন্ধান পান নি বেহান? আর তাইতে ওঁর সঙ্গে আমার পছন্দর যে আশ্চর্য রকম মিল রয়েছে।"

"কি বেহাই, কৈ আমায় বলে নি ত বৌমা!"

"কেন, নোনা ইলিশ।"

গল্পটা নেপথ্যেই রইল। প্রথমে একটু অপ্রতিভ হাসি। কিন্তু অতি-আমুদে মানুষ, সে ঠাট্টা নিতেও জানে, নিজেকে উপলক্ষ্য করে হাসতেও তার বাধে না। হাসিটা আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে প্রায় লুটোপুটি, ক্রমে স্বামীও, আর দীননাথ ত আছেনই; মনে হ'ল আশেপাশে বৌ-ঝিদের মধ্যেও পৌছে গেছে হাওয়াটা—কোন কথা নেই, চাপা খিলখিল খলখলে সমস্ত বাড়িটা যেন লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে।

কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নয়। সুযোগের সন্ধানেই ছিলেন, বিকেলবেলা একা পেয়ে বেহান এসে ধরলেন দীননাথকে।

"কে বলেছে বলতে হবে বেহাই—আমার কাছে ছাড়ান্ নেই!"

দীননাথের মুখটা একটু শুকিয়েই গেল। কৌতুকের হঠকারিতায় এ সম্ভাবনাটা তখন ভেবে দেখা হয় নি। কিন্তু বিপদটা আপনি আপনিই গেল কেটে। বেহান ঠোঁটে হাসি টিপে মুখের দিকে একটু চেয়ে রইলেন, তারপর উত্তর না পেয়ে বললেন—"তা'হলে আমিই না হয় বলি?"

দীননাথ একটু শুষ্ক কণ্ঠেই বললেন—"বলুন না।"

"আপনার গুণনিধি বেহাই ঠাকুরটি আর কে? সকালে দু'জনে যে অত হাসাহাসি হচ্ছিল সেটা নিশ্চয় এই নিয়ে, এখন ত বুঝতে পারছি। তা'হলে আমিও বলি বেহাই, জয়নগরের মোয়াও নয়, বর্ধমানের সীতাভোগও নয়; কী না একটু নোনা ইলিশ, আমাদের মেয়েছেলেদের অমন একটু আদাড়ে লোভ হয়ই—টক বলুন, ঝাল বল্‌ন, নোনতা বলুন—লুকুনো নেই কারুর কাছে। তাও কত বয়েস তখন?—দশ কি এগারো—সেকাল বলেই না কনে-বৌ,

কেউ বাকি নেই

আজকালকার মেয়েরা ত ও-বয়সে ফ্রক পরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।...আর উনি,—আপনার বেহাই!..."

চুপ করে মুখের দিকে চেয়ে আছেন, দুষ্টু হাসিটা চোখে-মুখে যেন লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে। দীননাথের মুখেও সে হাসির ছোঁয়াচ লেগেছে, একটু কুণ্ঠিত ভাবে জিগ্যেস করলেন—"বেহাইয়েরও এ দোষ ছিল নাকি?"

"ছিল মানে?"

—বেহান একবার সন্তর্পণে উঠে গিয়ে দরজার মধ্যে মাথাটা গলিয়ে ভেতর দিকটা দেখে নিয়ে আবার এসে বসলেন। চাপা গলায়ই কথা হচ্ছিল, আরও একটু চেপে বললেন—"ছিল কি বলছেন বেহাই!...এককালে ছিল, এখন নেই তা'হলে ত বাঁচতুম...এই কালকের কথা, এখনও মুখ শুঁকলে মনোহরার গন্ধ পাওয়া যাবে..."

"সত্যি নাকি?"

—এতবড় গোপন কথাটা শুনে একটু যেন অপ্রতিভও হয়ে পড়েছেন দীননাথ, তবু বিস্ময়ে-কৌতুকে মুখটা আরও দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বেহানের ত কথাই নেই, একটু আক্রোশ ছিলই, তার ওপর, হাউ-হাউয়ে মানুষ, আমোদ পেলে আর কিছু চান না—তা নিজেকে নিয়েই হোক বা অপরকে নিয়েই হোক—স্বামী হলেও বাধা নেই। চাপা হাসিতে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটা উঠছে দুলে দুলে—

"বুঝলেন না?—ডাইবিটিস রুগী সে, মিষ্টির ত্রিসীমানার মধ্যে যাওয়া বারণ ডাক্তারের; কড়া শাসনের মধ্যে রাখতে হয়েছে। কিন্তু কচি ছেলের মতন মিষ্টির লোভ বেহাই, আর বলবেন না—সে মানুষ কখনও শাসন মানে?—তার বাড়িতে হাঁতু ময়রার দোকানের মনোহরা...সকালবেলা বাক্সর চাবি বের করতে গিয়ে, পকেটে হাত দিতেই—ওমা! এ যে মনোহরার গুঁড়ো! হ্যাগা, বলি একি কাণ্ড!..."

হাসির দমকে কথাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে—

"গুণের কথা আর কত শুনবেন বেহাইয়ের? মাঝখান থেকে খোকাটার নিগ্রহ—আমি ভেবে সারা আধাআধি সন্দেশ...একটা শিশুতে...তা ইদিকে সে বুড়ো খোকা...লুকিয়ে লুকিয়ে...উঃ, বাবা গো! কত হাসব?...পেটে খিল ধরিয়ে দিলে!..."

রাজকন্যা

ভেতর দিকে আর ভালো জায়গা নেই, শহরটা তাই এবার বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। উত্তর দিকে যে একটা বস্তি ছিল, বস্তির মালিক সেটা পরিষ্কার করিয়ে নিয়ে জমিটা টুকরো টুকরো করে বিলি করে দিয়েছেন। বাড়ি-ঘর উঠছে; কোনটার বনেদ পর্যন্ত উঠেছে, কোনটার আর একটু বেশী; একখানা শেষ হয়ে গেছে। দোতলা নূতন ফ্যাশানের ভালো বাড়ি। দোর গোড়ায় ভরা কলসি, কলা গাছ। আর অন্য সব মাঙ্গলিক। বাড়িওলা কৃষ্ণধনবাবু নূতন গৃহপ্রবেশ করেছেন।

জায়গাটা খুব ফাঁকা। শহরের দিকে একটা জলা পড়ে, কলোনীটা গড়ে উঠলে এটাকে নাকি লেক ক'রে দেওয়া হবে; পেছনের দিকটায় টানা ক্ষেত। লোকজনও নেই; বস্তির লোকেরা উঠে গেছে, এদিকে নূতন বাসিন্দাও আসে নি; সমস্ত দিন এক রকম খাঁ-খাঁ করতে থাকে, রাত্রে একেবারে নিঝুম।

কৃষ্ণধনবাবুর পরিবারটি মাঝারি গোছের। ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, পুত্রবধূ প্রভৃতি নিয়ে জন দশেক। এদিকে সোফার, পাচকঠাকুর, চাকর, ঝি, আরদালী, মালী নিয়ে জন ছয়। কুকুর আছে এক জোড়া, এ্যালশেসিয়ান; বন্দুক আছে।

আর আছে রাখু, নাতি। লোকজন কুকুর বন্দুক থাকা সত্ত্বেও গৃহিণী শহর ছেড়ে এই তেপান্তরে এখন এসে উঠবেন কিনা ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না, রাখু সাহস দিল—"তুমি চল, কিছু ভয় নেই, এই যে আমি আছি।"

ছেলেটির মনটা এ্যাডভেঞ্চারে ঠাসা একেবারে। এমনি তার কাজ হ'ল দুপুরে আর সন্ধ্যায় ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনা আর বাকি সময়টা খেলনা বন্দুক নিয়ে ডাকাত আর রাক্ষসদের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো; এখানে এসে—বোধ হয় ঠাকুরমা তার ভরসায় এসেছে এই ধারণায়; খোঁজাখুঁজিটা আরও গেছে বেড়ে। নূতন জায়গা, সবাইকে একটু অন্যদিকে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাইতে অবাধে খোঁজাখুঁজির একটু সুবিধাও হয়েছে। জায়গাটাও এমন যে দৈত্য, ডাকাত—এদের প্রাচুর্য কল্পনা করে নিতে মোটেই বাধে না। লোকজন নেই, তার কারণ এরা সব এখানে-ওখানে যে লুকিয়ে আছে,—ঐ নূতন বাড়িটার এলোমেলো দেয়ালের

পেছনে, দূরের ঐ তেঁতুল গাছটার ঝাঁকড়া মাথার মধ্যে। আরও দূরে ঐ যে চিক-চিক করছে জল, ওর মধ্যে।

জলটাই সবচেয়ে বেশী করে রাখুর মনকে দেয় নাড়া, ওর কল্পনাকে তোলে জাগিয়ে। ঠাকুরমার কাছে শোনা গল্পটা ঐখানটায় এসে যেন সত্য হয়ে ওঠে। ঐখানে জলের মধ্যে দিয়ে অনেক নীচে, অনেক নীচে ডুব গেলে, গিয়ে দেখা যাবে প্রকাণ্ড বাড়ি, তার চারিদিকে দৈত্যরা দিচ্ছে পাহারা; তাদের চোখ এড়িয়ে সেই একটা ঘরে পৌঁছে গেলে দেখা যাবে, রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে শুয়ে ঘুমুচ্ছে, তার মাথার কাছে সেই সোনার কাঠি, রূপার কাঠি···

এই গল্পটাই বেশী করে আজকাল শোনে ঠাকুরমার কাছে রাখু, মনে হয়, কোথা থেকে ঘুরে ঘুরে, কি করে ঠিক সেই জায়গাটায় এসে গেছে, এইবার একদিন নেমে গেলেই হয়। তারপর কি করে কোথা দিয়ে যেন কিসব হয়ে যাবে, দেখবে সে একেবারে দৈত্যে-ঘেরা পুরীর মধ্যে রয়েছে দাঁড়িয়ে। ঠাকুমার গল্প উঠবেই একদিন সত্যি হয়ে এবার।

—ঐ জলের অতলে কিম্বা ঠিক উল্‌টো দিকে ঐ ঝাঁকড়া-মাথা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের তলায়, দিনের বেলাও সেখানে দৈত্যরা অন্ধকারে ছায়া মূর্তি ধরে থাকে লুকিয়ে, সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আরও দৈত্যরা ছায়া-রূপ ধরে এসে জড়ো হয়।

একদিন বিকালে হঠাৎ বাড়িতে সোরগোল পড়ে গেল,—রাখুকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর ঘুরে বেড়ানো একটা রোগ আছে জানে সবাই। আগেকার বাড়িতে অদৃশ্য হয়ে যেত মাঝে মাঝে। কিন্তু সে অল্প পরিসর জায়গা, একটু খোঁজাখুঁজির পর সন্ধান মিলে যেতো; চিলের ছাতের সিঁড়িতে, কিম্বা অন্য কোন নিরিবিলি জায়গায় চুপটি করে বসে আছে, হাতে বন্দুকটা, কিম্বা হয়তো পাশে রাখা, দৃষ্টি কোন সুদূরে। ক্রমে গা সওয়াও হয়ে গিয়েছিল, কেউ আর খুঁজত না; খুঁজলেও জায়গাগুলো চেনা থাকায় উৎকণ্ঠিত ভাবটা কেটে গিয়েছিল একেবারে। এখানে এই নির্জন পল্লীতে এসে ওর ঐ যাযাবর বৃত্তিটা যে কত বিপজ্জনক সবাই এই যেন প্রথম উপলব্ধি করল। বেশ একটু হৈ-হৈ পড়ে গেল।

রাখুকে পাওয়া গেল ঝিলের ধারে। একটা বাবলা গাছের চারিদিকে কিছু

আগাছার ঝোপ-ঝাড় হয়ে একটা আড়াল সৃষ্টি করেছে, তার ওদিকে ঝিলের সামনাসামনি হয়ে বসে আছে রাখু।

একচোট খুব বকাবকি হ'ল, বাবা-কাকাদের হাতের চাপড়টা-আসটাও পড়ল গোটাকতক, কড়া পাহারার মধ্যে এ্যাডভেঞ্চার ক'টা দিন পঙ্গু হয়ে রইল। তারপর আবার একদিন সবার দুশ্চিন্তাটা চতুর্গুণ হয়ে এল ফিরে। এবার ঝিলে জাল পর্যন্ত টানতে হ'ল। রাখু অদৃশ্য হয়েছে আবার।

কাহিনীর এ অংশটা রাখুর দিক থেকে বললেই বুঝতে সুবিধা হবে—

দুপুরবেলা। খাওয়া-দাওয়া করে বাবা কাকা আর দাদারা অনেক আগে বেরিয়ে গেছে—বাবা আর কাকারা চামড়ার ব্যাগ হাতে করে, দাদারা বই নিয়ে, যেমন যায় রোজ। বাড়ির আর সবাই খেয়েদেয়ে ঘুমুচ্ছে, ঠাকুরমাও গল্প বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ল। অন্য দিন রাখুও পড়ে ঘুমিয়ে, আজ কি হয়েছে ঘুমের পরী তার চোখের কাছ দিয়েও যায় নি। ঘরের মধ্যে বিলাতী খেলার সরঞ্জাম, খানিকটা নাড়াচাড়া করল নিয়ে, তারপর জানালার ধারটিতে গিয়ে বসল।

দোতালার ঘর, নীচে অনেক দূর পর্যন্ত যায় দেখা। বাড়ি থেকে খানিকটা এগিয়ে আর একখানা যে বাড়ি তোয়ের হচ্ছে তাতে লোকজন খাটছে, তার পরেই যতদূর দৃষ্টি যায় একেবারে নির্জন। সাদা রোদ রয়েছে চারদিকে ছড়িয়ে, এত বেশী করে ঘুমন্তপুরীর কথা মনে পড়ছে, রাখুর সে মনটা যেন আইঢাই করছে। ওর বদ্ধ ধারণা, ঝিলের দিকে পা বাড়ানো যে কড়া রকমের বারণ, নৈলে এতদিন কোন-না-কোন উপায়ে আনত্ত্ব ত উদ্ধার করে রাজকন্যাকে।

ভাবছিল বসে; ভাবতে-ভাবতে বন্দিনী রাজকন্যার জন্য মনটা করুণায় ভরে উঠেছে, এমন সময় এক আশ্চর্য ব্যাপার হ'ল। রাখু বসেছিল ঝিলের ঠিক উল্টো দিকে মুখ করে; ঝিলের দিকে চাইতে পর্যন্ত মানা করে কাকা ওদিক'কার জানলা সব বন্ধ করে দিয়েছে। এদিকেও যে দেখবার কিছু নেই এমন নয়; সেই তেঁতুল গাছটা রয়েছে নিজের গায়ে অন্ধকার জড়িয়ে। তারই গোড়ায় দৃষ্টি ফেলে বসে ছিল রাখু—এমন সময় একটি মেয়ে গাছতলার ঝোপের মধ্যে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল, তারপর কিসের জন্যে বেরিয়ে আসা সেটা টের পাওয়ার আগেই তেমনি হঠাৎ আবার ঝোঁপের মধ্যে গেল সেঁদিয়ে।

এইটুকু, কিন্তু এইতেই রাখুর চিন্তার স্রোত একেবারে গেল ঘুরে। ওর মনে

হ'ল ঠাকুরমার মুখের গল্পটা আরও সত্যি হয়ে উঠে, ওর একেবারে কাছাকাছি গেছে এসে। রাজকন্যাকে কেউ উদ্ধার করে এনেছে।

কিন্তু উল্লাসের চেয়ে করুণায় বাপ্পুর মনটা গেল আরও যেন গলে। ঐ এক নজরে যতটুকু পেল দেখতে তাতে মনে হ'ল কন্যার গয়নার ঘটা ত নেই-ই, গায়ে একখানা জামা পর্যন্ত নেই, আর তার চেয়েও যা মর্মান্তিক, ওর কোমরে নিতান্তই মলিন, ছিন্ন একখানি যেন ন্যাকড়া জড়ানো। রাজকন্যা মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু একেবারে রিক্ত হয়ে। অস্থির হয়ে পড়ল বাপ্পু। ইচ্ছা করে নেমে ছুটে যায়, জিগ্যেস করে—তোমার এ দশা কে করেছে? কিন্তু সে নিজেই ত বন্দী। সমস্ত দুপুরটা জানলায় নিরুপায় ভাবে বসে চিন্তা করতে লাগল। নিজে বন্দী বলে আরও যেন আপন বলে মনে হচ্ছে ওকে, ক্রমে এও মনে হ'ল সেও মুক্ত নয়। জলের মধ্যে ও এক দেশের দৈত্যদের কবলে ছিল, এখন অন্য দেশের দৈত্যরা ওকে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে এই রকম নিঃস্ব করে দিয়ে নিজেদের পাহারায় রেখেছে আটকে, তেঁতুল গাছের অন্ধকার হয়ে সে দৈত্যরা থাকে লুকিয়ে।

সেদিন আবার বাড়িতে একচোট সোরগোল উঠল। ঝিলের ধারের সেই ব্যাপারটার পর কয়েকটা দিন কেটে গেছে। বাপ্পু তার বন্দুক নিয়ে বাড়িতেই আশেপাশে থাকে, বন্দুকের শব্দ হয় মাঝে মাঝে, সবাই নিশ্চিন্ত থাকে, নজর রাখার দরকারও হয় না, সেদিন কিন্তু হঠাৎ কাজকর্মের মধ্যে কারুর কারুর খেয়াল হ'ল শব্দটা যেন অনেকক্ষণ কানে আসে নি। খোঁজ পড়ে যেতে দেখা গেল, কাছে পিঠে কোথাও নেই বাপ্পু।

সেদিন ত কি হয়েছিল, তার চতুর্গুণ হৈ চৈ পড়ে গেল বাড়িতে। কর্তারা আফিস থেকে ছুটে এলেন, ছেলেরা স্কুল কলেজ থেকে। চারদিকে লোক ছুটিয়ে দেওয়া হ'ল, থানায় খবর দেওয়া হ'ল, ঝিলে জাল ফেলাও হ'ল, কোন স্থানেই কোন সন্ধান না পেয়ে সবাই হাত পা এলিয়ে দিয়েছে, কান্নাকাটিও পড়ে গেছে বাড়ির ভেতর, এমন সময় সামনের বাড়িতে যে মজুরেরা খাটছে, তাদের একজনের মুখে খবর পাওয়া গেল, সে একটি ছেলেকে নতুন বাউড়ির বাড়ির দিকে যেতে দেখেছে, জুতা জামা পরা, হাতে একটা বেশ বড় খেলনার বন্দুক, সঙ্গে একটা বড় কুকুর। সবার হুঁশ হ'ল, এ্যালসেশিয়ানের একটা

রয়েছে বাঁধা, আর একটা—সেটাকে নিয়ে রাখু বেশী ঘাঁটাঘাটি করে, সেটা ত নেই!

কিন্তু রতন বাউড়ি কে? তার বাড়িই বা কোথায়?

ওর কাছেই খোঁজ পাওয়া গেল—বুড়ি রতন বাউড়ি দিনমজুরি করে খায়, একেবারে শেষের দিকে যে বাড়িটা উঠছে, আজকাল সেই বাড়িটাতে খাটছে, সংসারে নিজের বলতে ছোট্ট একটি নাতনী; রতনের বাড়ি ঐ তেঁতুল গাছের নীচে।

একদল ছুটল সেই দিকে। হতে-করতে এদিকে রোদ'ও প্রায় মিলিয়ে এসেছে আকাশে।

রতন বাউড়ির বাড়ি বলতে—তেঁতুল গাছের ওপাশটার ঝোপঝাড়ের মাঝে একটু জায়গা পরিষ্কার করে একখানি কুঁড়ে ঘর, কঞ্চি আর খড়ের ওপর মাটি লেপা দেওয়াল, চালে আছে কিছু খড় কিছু তালপাতা, আর একখানা ছেঁড়া মাদুর।

নীচে এক টুকরো ছেঁড়া মাদুরে রতন বাউড়ির নাতনী ঘুমুচ্ছে। ফুটফুটে না হোক, ধুলো-ময়লার নীচে রংটা একটু কটাই, মাথার চুলটা রুক্ষ, আর সেই জন্যেই তামাটে। কোমরে যে ছেঁড়া ন্যাকড়াটুকু রয়েছে সেটা না থাকলেও ক্ষতি ছিল না।···রতন বুড়ি এখনও মজুরি খাটছে নিশ্চয়।

পাঁচ রকম ডালপালা দিয়ে ঘেরা ছোট্ট উঠোনটুকুর মাঝখানে প্রকাণ্ড এ্যালসেশিয়ানটা থাবা পেতে বসে আছে। ও-জাতের কুকুর একজন লোককেই চেনে, একটা হুকুমই মানে। এরা গিয়ে পড়তে একবার ঘুরে দেখে নিয়ে ল্যাজটা একটু নেড়ে আবার থাবায় মুখ চেপে বসল।

রাখুও পাশে দাঁড়িয়ে। হাতে বন্দুকটা রীতিমতো ট্রিগার টেনে ধরা। গম্ভীরভাবে একেবারে তদ্‌গত হয়ে সামনে ছিল চেয়ে, এরা গিয়ে পড়তে একবার হাত উঁচিয়ে ফিসফিস করে বলল—"চুপ, এখন ঘুমুচ্ছে !!"

সবাই অবাক হয়ে রইল দাঁড়িয়ে।

রাজকন্যা ঘুমুচ্ছে। কঞ্চি-খড়ের দেয়ালের ছেঁদা দিয়ে পড়ন্ত রোদের একটা রেখা সেঁদিয়ে গায়ের ওপর আস্তে আস্তে যাচ্ছে মিলিয়ে।

লেক্‌শন্‌

জায়গাটি আবার বেশ ভাল ক'রে সাজানো হয়েছে।

একটি মাঝারি সাইজের শামিয়ানা। খুঁটিগুলো দেবদারু পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। রঙীন কাপড়ের ঝালর, রঙীন কাগজের শেকল, পতাকা। একটি বেশ বড় টেবিল গেরুয়া রঙের কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। দু'দিকে দু'টি ফুলদানি, পাশেই পেতলের স্ট্যাণ্ডে ধূপকাঠির গুচ্ছ; সমস্ত জায়গাটি ধূপের গন্ধে বেশ একটি সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এদিকে বিজলীবাতি, বসার জন্য চেয়ার। যাতে অবাঞ্ছিতদের ভিড় না হয় তার জন্য সমস্ত জায়গাটা কানাত দিয়ে ঘেরা।

ব্যবস্থাটা সেবারের চেয়ে যথাসাধ্য আরও ভালোই করা হয়েছে। তার কারণ মহারাজ সেবারে এসে বেশ বড় গোছের একটি ভক্তমণ্ডলী তৈয়ের করে যান। তার মধ্যে অনেকেই পরে তাঁর শিষ্যত্বও গ্রহণ করেছেন। সেবারের আকর্ষণ ছিল শুধু তাঁর নাম ডাক, এবার তার ওপর রয়েছে পরিচয়ের বিশ্বাস। ব্যবস্থাও যেমন ভালো, সমাবেশও তেমনি বিশিষ্ট এবার। শহরের অনেক ভালো ভালো লোকই এসেছেন, চেয়ারগুলি প্রায় সবই ভরে গেছে।

যে সংঘের পক্ষ থেকে আয়োজনটা করা হয়েছে, তার সম্পাদক উঠে মহারাজের পরিচয়টা দিয়ে দিলেন। আজ দু'বৎসর পরে তাঁকে আবার বহু কষ্টে পাওয়া গেছে। কর্মযোগী পুরুষ, তাঁর বাণী ধারণ ও প্রচার করবার জন্যে বারাণসীতে যে আশ্রম গড়ে তুলছেন তাই নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, সবার আকুল আহ্বান আর অগ্রাহ্য করতে না পেরে মাত্র একটি দিনের জন্য আবার এসেছেন প্রত্যক্ষভাবে আবার তাঁর উপদেশ দিয়ে যেতে, এবার তাঁর বক্তব্য হবে মানব-জীবনের সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধ।

মহারাজ উঠলেন। প্রকৃতই সাধু পুরুষ, শরীর থেকে যেন সত্যেরই জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। গোড়া থেকেই সভামণ্ডপ তার প্রভাবে যেন গমগম করে উঠল। শ্রোতারা, সব ভাবস্তব্ধ, মহারাজ তাঁর ভাষণ আরম্ভ করলেন—

সত্যই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। নদীর প্রবাহ যেমন সমুদ্রের দিকে, জীবাত্মার প্রবাহও তেমনি এই সার সত্য ব্রহ্মের দিকে। কিন্তু এই প্রবাহের গতি ঋজু নয়।

যা অলীক, যা অসত্য তা ক্রমাগত বাধাস্বরূপ হয়ে এই গতিকে করেছে ব্যাহত—স্রোত হয়ে উঠছে জটিল, পথ দীর্ঘীকৃত, ফলে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যে বিলয়, যা নাকি জীবনের মূল উদ্দেশ্য, তা হয়ে পড়ছে বিলম্বিত।

জীবের আত্মোপলব্ধির পথে প্রধান অন্তরায় এই যে মিথ্যা, একে চেনবার জন্য দৃষ্টিকে একেবারে করে ফেলতে হবে মুক্ত—মোহমুক্ত, দ্বিধামুক্ত। এই যে মোহ, এই যে দ্বিধা, এর মূল আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে। এই স্বার্থের প্রকৃত রূপ চেনা চাই, বোঝা চাই, তা না হলে একে অতিক্রম করা ত সম্ভব নয়। কিন্তু এর জন্যে অন্তর্দৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন, তা পাওয়া যায় কি করে? জীবনের প্রতি মুহূর্তই ত এই স্বার্থের দ্বারা গঠিত। যা আমাদের নিত্য সহচর, নিত্য আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে যা, তাকে আমরা আলাদা ক'রে উপলব্ধি করতে পারি না, যেমন ধরাপৃষ্ঠের জীব আমরা আকাশমণ্ডলকে পারি না উপলব্ধি করতে, জলের জীব পারে না তার জলাবরণকে।

তবুও চিনতেই হবে এই স্বার্থজ-মোহকে, চেনবার জন্যে দৃষ্টিকে করে আনতেই হবে স্বচ্ছ, নইলে জীবের গতি নেই।

এই দিব্যদৃষ্টির জন্যে চাই তপস্যা। তপস্যার আলোকেই এই মিথ্যাকে আমরা চিনে নিতে পারি। তপস্যার অগ্নিতেই একে করতে পারি দগ্ধ।

আমাদের আর্য ঋষিরা এই সত্যের স্বরূপ পেরেছিলেন চিনতে। তাই কর্মে, বাক্যে, চিন্তায়, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই এই সত্যকে দিয়ে গেছেন সর্বোচ্চ আসন। তাঁরা যে একে কত উচ্চ আসন দিয়ে গেছেন তা এই থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে আমাদের পূর্বজদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠ পুরুষ, মহারাজ যুধিষ্ঠির, মিথ্যার অতি সামান্য ইঙ্গিত ও উচ্চারণের জন্যে তাঁকেও নরক দর্শন করতে হয়েছিল। সত্যের এর চেয়ে বড় আদর্শ আর কোথাও সৃষ্ট হয়নি। আমরা যখন সেই বিরাট আদর্শের উত্তরাধিকারী তখন মিথ্যা যতই দুর্নিরীক্ষ হোক, সত্য যতই হোক দুর্লভ, আমরা আমাদের তপস্যায় জয়ী হবই···

শাস্ত্র থেকে নানা রকম উদ্ধৃতি দিয়ে, উদাহরণ দিয়ে প্রায়, দুই ঘণ্টার পর মহারাজ আসন গ্রহণ করলেন। অভিভূত সভামণ্ডপ একটু নিস্তব্ধ হয়ে রইল। সংঘের তরফ থেকে ধন্যবাদাদি দেওয়ার পর সভা ভঙ্গ হ'ল। উদ্যোগীরাই আশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থাও করেছিলেন। একটি বড় পিতলের পরাত, টাকা আর নোটে প্রায় ভ'রে গেল; কিছু প্রতিশ্রুতি-পত্রও। সভা ভঙ্গ হ'ল।

আমাদের শেঠজীও এসেছেন। প্রকৃতই সাত্ত্বিক পুরুষ একজন, কেননা ওঁরা যখন ত্যাগ করেন তখন সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েই ত্যাগ করার ক্ষমতা রাখেন। চক্ষুর অন্তরালেই যথাসম্ভব রাখেন নিজেকে; কখন এসে নিঃসাড়ে পেছনের একটি চেয়ারে বসে তদ্‌গত হয়ে শুনছিলেন, সভা ভঙ্গ হলে একটি নিভৃত স্থান দেখে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সভামণ্ডপ আস্তে আস্তে খালি হয়ে এল। ভক্তের দল টেবিলের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘিরে রইল। তাঁরাও চলে গেলে রইলেন উদ্যোক্তাদের জন কয়েক। টাকা নোটগুলো গুছিয়ে নেওয়া হচ্ছে, মহারাজ নিজের আসনে রয়েছেন বসে। একটু-আধটু এদিক-ওদিক আলোচনা হচ্ছে। এদিক থেকেই স্টেশনে গিয়ে উঠবেন।

নিতান্ত জড়োসড়ো হয়ে শেঠজী এসে পাশটিতে দাঁড়ালেন। তারপর অসীম বিনয়ের সঙ্গে দশটি মোহর থালাটার একপাশে রেখে দিয়ে বললেন, "আশ্রমের জন্যে গরীবের থোড়া ভেট, মহারাজ, নিয়ে কৃতার্থ করুন।" দানটা ত বিশিষ্ট, দাতার মধ্যেও একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে বেশ। মহারাজ একটু চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। তারপর তাঁর মনে পড়ে গেল। প্রসন্ন একটু হাসির সঙ্গে বললেন—"আপনাকে ত চিনি শেঠজী; সেবারও আশ্রম আপনার অযাচিত দান পেয়ে বিস্তর উপকৃত হয়েছিল। আপনি সত্যিই মহানুভব।"

শেঠজী লজ্জিত হয়ে পড়লেন, ঘাড়টা একটু নামিয়ে জোড় হস্তে বললেন—"কুছু নোয় মহারাজ, আমি এক দোকড়া কা ভি আদমি নই। আমি কি করতে পারে? আসে, পিছনে আপন জগহটিতে বসে বসে শোনে আবার দণ্ডবৎ করে আপন ঝোপ্‌ড়িতে চলে যায়। মহারাজের মুখের কথা এক এক অচ্ছর লাখ টাকা; আমি তার কি দাম দিতে পারে?"

সম্পাদক টাকা আর নোটগুলো গুছিয়ে তুলতে তুলতে বললেন—"তাই বা ক'টা লোকে বলে বলুন। মহারাজের কথার মূল্য বোঝা, স্বীকার করা,—সেও ত মহানুভবেরই লক্ষণ।"

বিনয়ে আরও নুয়ে পড়লেন শেঠজী, বললেন—"কুছুনা, বাবুজী, মহানুভব—টব ও-সব কুছু না। মহারাজের উপদেশ শুনে নফা উঠায়, ব্যস্। যেতো নফা উঠায় তার হিসাবে কি দিতে পারে?"

মহারাজ বললেন—"লাভ যে ওঠান্ এইটেই আমার পক্ষে যথেষ্ট শেঠজী। এ

যা আশ্রম তৈরির ব্যাপার এ ত বাইরের, একজন মানুষের মনও যদি তৈরি করতে পারি তার চেয়ে বড় সার্থকতা আমার কি আছে বলুন। বড় আনন্দ হ'ল শুনে। আমার বক্তব্য শুনে আপনি যদি অল্পকিছুও লাভবান হয়ে থাকেন···"

"অল্প নয় মহারাজ, পুরা নফা উঠিয়েছে। অগ্‌লে অগ্‌লে বার যে আপনি ভাষণ দিলেন—অহিন্‌সা নিয়ে তার এক এক অচ্ছর আমার মনে আছে মহারাজ। আর পুরা নফা উঠিয়েছে···"

"বড়ই আনন্দ হ'ল শুনে শেঠজী।"

"পুরা নফা উঠিয়েছে মহারাজ। ইয়াদ্ থাকতে পারে শুধু খটমলদের হিন্‌সা কোরবার হুকুম চেয়ে নিয়েছিল মহারাজের কাছে—যারে আপনারা ছারপোকা বোলেন। তা হয়রান হয়ে উ হিন্‌সাভি ছেড়ে দিয়েছে। বোলে—যা শালা কোতো খুন চুষবি চুষে লে, আমি পরোয়া করে না। ইবার আবার মহারাজের মুখে সত্য ভাষণের উপদেশ শুনলো। নজর খুলে গেলো।"

"সত্যিই খুব আনন্দ হ'ল আপনার কথা শুনে শেঠজী। সংসার বড় ভয়ানক জায়গা। কত প্রলোভন চারিদিকে, তার মধ্যে সত্যে অটল থেকে জীবন নির্বাহ করা, সে যে কি কঠিন···"

"সে আমি বিলকুল অটল থাকব মহারাজ, শপথ করিয়ে নিন।···লেকিন···"

অতিমাত্র কুণ্ঠিত হয়ে শেঠজী চুপ করে গিয়ে মাথা নত করলেন।

একটু চুপচাপ গেল। ওদিকে টাকা নোট গোণা-গাঁথা হয়ে গেছে, এবার মহারাজকে নিয়ে মোটরে গিয়ে ওঠা। কিন্তু শেঠজীর হঠাৎ ভাবান্তরে সবাইকেই একটু থমকে দাঁড়াতে হ'ল। কিছুই বলেন না দেখে সম্পাদক বললেন—"লেকিন বলে থেমে গেলেন শেঠজী, কিছু বলবেন কি মহারাজকে?···আমাদের এখান থেকেই গিয়ে গাড়ি ধরতে হবে।"

শেঠজী ফতুয়ার পকেট থেকে আরও দু'টি মোহর বের করে শূন্য থালাটায় রাখলেন। মহারাজের দিকেই চেয়ে করজোড়ে নিবেদন করলেন—

"আমি অটল থাকবে, জানে হনমানজী; মহারাজের উপদেশ অচ্ছরে অচ্ছরে পালন করবে। দেখুন, খটমল হিন্‌সা করাভি ছেড়ে দিয়েছে। বললো, খা শালা কোতো লেহু খাবি আমি মহারাজের উপদেশ থেকে অলগ হোব না। সত্য ভি ঐরকম পালন করব, লেকিন যাবার আগে শুধু একটো এজাজৎ দিয়ে যান···"

"বলুন।"—একটু বিস্মিতই হয়ে গেছেন।

লেক্‌শন্‌

"লেক্‌শন্‌ এসে গেল, ভোটাভোটি, মুন্সিপালিটির কমিশনার হোবার জন্যে ভোট মেঙে বেড়াচ্ছে। যে হোবার হোক ইতে আমার কি আছে মহারাজ? কেউ রাজাও করে দেবে না, কেউ বাদশাও করে দেবে না। লেকিন বিলকুল চৈন নেই, জান্‌ হায়রান করে দিয়েছে। সোকাল, দুপহর, সোঞ্ঝা, রাত, যোখোন দেখুন একজন না একজন হাজির! সোভি কেমন—একজন ত ডাগদর, উস্‌পর আমার বাড়ির ডাগদর। উই গেল ত উকিলসাহেব এসে হাজির; হরিহর বোস বাবু, আমাদের বংশীরাম গোকুলচন্দ ফারমের উকিল—হাতে একঠো ভারী কেসও রয়েছে। বাৎচিৎ হচ্ছে, দূর থেকে দেখে জমিদার হীরাবাবু তার গাড়ী ঘুরিয়ে চলে গেল—আবার সুবিস্তা বুঝে আসবে। জমিদার, ওরই মকানে বংশীরাম গোকুল চন্দের গুদাম। এবার খেয়াল করুন মহারাজ সচবাৎটুকু কেমন ক'রে কাকে বলি?···

ই-সব গেল ত রাত্রিবেলা আমার সম্‌ধি এসে হাজির, আমার লেড়কীর শ্বশুর উভি ভোটের জন্যে নাম দাখিল করেছে। উব সঙ্গে সম্‌ধিন্‌ভি! সচ পুছেন ত সম্‌ধির সঙ্গে আমার বিলকুল ভালোবাসা নেই মহারাজ; সাদিতে লেনদেন নিয়ে অনমন চলেছে দু'তরফে, লেকিন সচ বাৎ কি করে বলি বলুন? না কুছু লেনা, না কুছু দেনা, মুফতের জান হয়রানি। ইর ওপর যদি একজনকে "হাঁ" বলে বাকিয়ে তিনজনকে "না" বলি ত গায়ের মাংস ছিঁড়িয়ে খাবে। আর কাকে "হাঁ" কাকে "না" বলি বলুন?—এক ডাগদর, এক উকিল, এক জমিদার, এক সম্‌ধি, উব সাথে সমধিন্‌ভি আছে।

ইব জন্যে মহারাজের হুকুম নিয়ে রাখছি—'লেক্‌শনের ই-কটা দিন দু'খানি মিথ্যা কোথা বলতে দিন—সিরফ দু'খানি—"হাঁ হাঁ আপনাকে ছেড়ে কাকে ভোট দিবো? লেকিন গোপন রাখবেন কোথাটা।" ব্যস, সিরফ এই দু'খানি···আর, ইব জন্যে যদি নরক দর্শন হোয় ত যেন উদেরই হোয় মহারাজ, গরীব হাজারীমল শেঠ কি করিয়েছে?"

অজ-পুরান

সারা শহরে হৈচৈ পড়ে গেছে।

হৈচৈ অবশ্য এদিকে কয়েক বছর ধরেই হচ্ছে এ-সময়টা, পুজায় বলিদান হবে কি হবে না এই নিয়ে। এই প্রশ্নকেই কেন্দ্র করে পুজার মিটিং, কমিটি গঠন, প্রেসিডেণ্ট-সেক্রেটারি প্রভৃতির নির্বাচন। মাসখানেক ধরে শহরের এদিকটায় আর অন্য কোন আলোচনাই থাকে না। ছেলে-ছোকরাদের প্রায় সবাই বিপক্ষে, বড়দেরও অনেকেই, কিন্তু পুরাতন পন্থীদের মধ্যে এমন জনকয়েক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী রয়েছে যে কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না বলি। আন্দোলনটা অবশ্য বেড়েই চলেছে। গত বৎসর বলি-বিরোধীরা একটা আলাদা পুজার ব্যবস্থাও করেছিল, এরা ক'জন কলকাঠি নেড়ে বিভেদ সৃষ্টি করে এমন অবস্থা দাঁড় করাল যে ভেস্তেই গেল পূজা বলা চলে ; কয়েক জন ত এদিকেই চলে এল, কয়েক জন জিদের ওপর করলে ঘটে, কিন্তু তা এতই দুর্বল আর নিষ্প্রভ যে একটা বছরেই তার আয়ু নিঃশেষ হয়ে গেল।

ও-হৈচৈটা এবারও উঠেছিল, কিন্তু ও বাৎসরিক হৈচৈয়ের কথা হচ্ছে না। ও যেমন ওঠবার উঠেছিল, তারপর ঠাণ্ডাও হয়ে আসছিল, তারপর এ এক একেবারেই নূতন ব্যাপার। মা নাকি নিঃসন্দেহ ভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আর পশুবলি চান না। স্বপ্নাদেশ বা ঐজাতীয় কিছু নয়, ওসব হুজুগ এর আগে এরা কয়েকবারই তুলেছে নানা আকারে, কোন ফল হয় নি। কাল সপ্তমী পূজা ছিল, তাইতেই নাকি এই নির্দেশটা স্পষ্ট পাওয়া গেছে দেবীর কাছ থেকে।

এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে—বিবরণটা নানা মুখে নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করছে। কেউ বলছে বলির পাঁঠাগুলার মধ্যে হঠাৎ একটা দাঁড়িয়ে উঠে ঠিক মানুষের মতো কথা কয়ে বলল—"মা, আমরা নিরীহ ছাগের দলই বিশেষ ক'রে কি এমন দোষ করেছি যে, আমাদের রক্ত না হলে তোর তেষ্টা যাবে না ?"...কেউ বলছে—ছাগলটা নিজে কিছুই বলে নি। পুরুতমশাই যথারীতি মন্ত্র পড়ে পাঁঠাটাকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন, বলিদানের বাজনা বেজে উঠেছে, এমন

সময় একটা বুড়ী ছাগলী কোথা থেকে গটগট করে এসে ছাগলটার পাশে দাঁড়াল, তারপর,—দু'পায়ে দাঁড়িয়ে ওঠা ওসব বাজে কথা, মাকে তো দু মেরে চটাতে আসেনি—তবে ব্যাঁ-ব্যাঁ ক'রে সে প্রায় মানুষের মতন করেই বললে—"যদি আমার ব্যাটা থাবি, মায়ের ব্যথা না বুঝবি ত জগজ্জননী নাম নিয়েছিস্ কেন বল্?"

নানা মুখে এই রকম বিভিন্ন প্রকারের কাহিনী। তবে সব বাদসাদ দিয়ে একটা জিনিস এই দাঁড়াচ্ছেই যে একটা ছাগল নিয়ে নূতন গোছের কিছু একটা হয়েছেই, তার ভীতত্রস্ত অঙ্গচালনার জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক—সেটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকায় বলিটা বন্ধ গেছে কাল।

কিন্তু আবার প্রতিক্রিয়াও হতে আরম্ভ হয়েছে। ব্যাপারটা যখন হয় তখন প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী এদের কেউ ছিল না। একটা বিঘ্ন হ'ল। বলির সময়টাও উৎরে গেল; আজ কিন্তু হবে বলি, কালকের পাঁঠাগুলোসুদ্ধ নিয়ে। এই ওদের ইচ্ছা, আরও সবার, যারা ওদের দিকে। তারা অর্থও করছে অন্যভাবে; বলছে—কথা কওয়া, ও সমস্ত বাজে, একেবারেই অবিশ্বাস্য—ব্যাঁ ব্যাঁ করে ডেকে থাকবে, সেটাকে যে যেমন খুশি ভেবে নিয়েছে—রেলগাড়ির শব্দ থেকে যেমন নিজের নিজের মনের মতো বুলি তোলে লোকে; তবে গড় করার মতো যদি কিছু করেই থাকে ত তার মানে ত এও হতে পারে, মা তোমার পায়ে আত্মসমর্পণ করলাম।

বলি দেওয়ারই ইচ্ছা বটে, ওপরে ওপরে সেটা জাহিরও করছে বটে, কিন্তু এটাও বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে যে, সুর আর সেরকম চড়া নেই, ক্রমেই খাদে নেমে আসছে। তার কারণ, ব্যাপারটা ক্রমেই কমিটি আর পূজার অন্যান্য উদ্যোক্তাদের এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাচ্ছে। আন্দোলনটা প্রতি মুহূর্তেই যাচ্ছে বেড়ে; একটা অশুভের আশঙ্কায় বলির বিপক্ষেই শহরের জনমত পুষ্ট হয়ে উঠছে।

আজ কর্তারা নিজেরাই উপস্থিত থাকবে। মুখে বলছে বটে বুজরুকিটা ভাঙবার জন্যই আসছে, কিন্তু, বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যে আর সম্ভব হবে না, এটা সকলেই বেশ টের পাচ্ছে।

শহরের আর-সব পূজা-মণ্ডপ একরকম খালি, যত ভিড় জমা হচ্ছে এ পাড়ার পূজায়। একটা গুজব রটে গেছে, অনেকে স্বপ্ন দেখেছে আজও নাকি ঐরকম কাণ্ড হবে।

আনন্দ-নট

দলাদলির জন্য পূজার ব্যাপারে থাকি না। বলিটা যে পছন্দ করি না সেটাও জানিয়ে দিই অনুপস্থিত থেকে; আজ কিন্তু আমিও বেরিয়ে পড়লাম অলৌকিক কিছু যে একটা দেখব এরকম প্রত্যাশা নিয়ে নয় অবশ্য, নিতান্ত একটা সহজ কৌতূহলের বশে যে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

চাপ ভিড়, পথ চলা যায় না। পূজামণ্ডপের যতই কাছাকাছি হচ্ছি, ভিড়টা আরও চাপ বেঁধে উঠছে; কোনরকমে রাস্তা করে এগিয়ে চলেছি, এমন সময় বেশ খানিকটা পেছনে একটা গোলমাল উঠল—"এই পাঁঠা!...এই পাঁঠাই ছিল! সরে যাও!...রাস্তা করে দাও!...তফাৎ! তফাৎ!...রাস্তা ছেড়ে!...জয় মা!... বুঝিয়ে দাও ভাই নাস্তিকদের!..."

ভিড়টা হঠাৎ পেছন দিকে মাথা করে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর যেন আপনা-আপনি রাস্তার ঠিক মাঝখানটায় লম্বালম্বি একটা গলির মতো হয়ে গেল। দেখি তার একেবারে শেষ দিকে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার প্রায় শ'খানেক হাত পেছনে একটা কালো পাঁঠা মাথা দোলাতে দোলাতে গটগট করে চলে আসছে, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, গলায় একটা জবাফুলের মালা। এগিয়ে আসতে আরও ভালো করে দেখলাম। এদিককার পাঁঠা ব'লে মনে হ'ল না। কান দুটো ঝোলা, নাকটা একটু ধনুকাকার। শিং দেখে মনে হয় খুব বেশী বয়স নয়, পাঁঠা হিসাবে নবযুবক, কিন্তু আকারে এদিককার পাঁঠাকে এর মধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে। রংটা কুচকুচে কালো একেবারে, ক্ষুর থেকে নিয়ে শিঙের গোড়া পর্যন্ত কোনখানে এতটুকু শাদা বা অন্য দাগ নেই। লোমগুলা একটু বড় আর মসৃণ, এদিকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হওয়ায় মনে হয় গায়ে মাছি বসলে যেন পিছলে পড়বে।

সবচেয়ে আশ্চর্য, চলার ভঙ্গিটা। এত যে ভিড়, এত চেঁচামেচি, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ ত নেই-ই, তার ওপর এমন একটা শান্ত অথচ ব্যস্তসমস্ত ভাব—মনে হয় কোথা থেকে যেন একটা কি মিশন্ নিয়ে এসেছে, সময় অল্প, সেটা সেরে আবার অন্যত্র চলে যেতে হবে। যদি বলা হয় যে, আমার মনটা হঠাৎ সেরকম একটা দৃশ্যে অভিভূত হয়ে পড়েছিল এবং এটা তারই প্রতিক্রিয়া, তবু একটুকু মানতেই হয় যে, ছাগলটা এইরকম ভিড়, এইরকম সমারোহে যেন অভ্যস্ত; বিচলিত হওয়ার মতো নূতন এমন কিছু পাচ্ছে না দেখতে এর মধ্যে।

আরও গোটা দুই মালা এসে পড়ল গলায়, পুষ্পবৃষ্টিতে পথ ত প্রায় ছেয়ে

এসেছে। তারপর একটা ব্যাপার যে হ'ল তাতে—হিন্দুরই মন ত, স্বীকার করতে লজ্জা নেই—আমার গায়েও কাঁটা দিয়ে উঠল।

হ'লও আমার একেবারে কাছাকাছি এসে। পাঁঠাটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। পুজার মণ্ডপটা এখান থেকে বেশ দেখা যায়, একবার মুখটা তুলে যেন দেখে নিল, তারপর পেছনকার পা দুটো মুড়ে মাটিতে নাক চেপে এক ভঙ্গি করল—তাকে সরাসরি প্রণাম ভিন্ন আর কি নামই বা দেওয়া যায়?

একটা তুমুল কলরব উঠল—"জয় মা !!···মহাবীরজী কি জয় !!···"

ভ্রূক্ষেপ নেই। উঠল। তারপর এবার আবার এক নূতন কাণ্ড; কয়েক পা যায় আর ঐ ব্যাপার। আমি পাশে পাশেই রয়েছি, গুণে দেখলাম, আশ্চর্য! —আগের পা ধরে ঠিক এগার পা যাচ্ছে আর ঐ প্রণাম।

"দণ্ডী কাটছে!···মায়ের কাছে দণ্ডী কাটতে কাটতে যাচ্ছে!···মা, মা, রক্ষে করো!···জগন্মাতা !!···"

মনে হ'ল মণ্ডপের ভেতর ভিড়টাকে আর সামলানো যাবে না, কিন্তু এখানেও একটা আশ্চর্য কাণ্ডই হ'ল বলতে হবে। পুজার জায়গার সামনে খানিকটা দূর পর্যন্ত একটা বাঁশের বেড়া রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা অত উত্তেজিত জনস্রোতের সামনে একটা কুটো; ভেসেই যেত, কিন্তু সমস্ত স্রোতটা ঐ পর্যন্ত এসে হঠাৎ গেল থেমে। একটা সমীহ, একটা সম্ভ্রম; রব উঠল—"উনি কি বলেন, কি করেন, নিশ্চিন্দি হয়ে বলতে দাও, করতে দাও!···বলো বাবা, তুমি বলো মাকে। শুনতে হবে মাকে!···আমরা রয়েছি তোমার পেছনে।···জয় মা !!···"

ছাগলটা বেড়ার মধ্যেকার ফাঁকা জায়গায় এসে একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এই সময় এদিকেও একটু বিশৃঙ্খলা হ'তে যাচ্ছিল। ভলন্টিয়াররা গিয়ে বেড়াটা আগলে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে। লোকগুলাও সংযতই ছিল, কিন্তু গেটের মুখ আলগা ক'রে পুজা সংক্রান্ত কয়েক জনকে, এবং তাদের সঙ্গে বিশিষ্ট কয়েক জনকে যেই প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে, চাপ দিয়ে হুড়-হুড় করে আরও কয়েক জন পড়ল সেঁদিয়ে। সবাই অবশ্য ছাগলটাকে বাঁচিয়েই গেল। ধাক্কা দূরের কথা, স্পর্শ পর্যন্ত কেউ করল না। কিন্তু এই ঝোঁকেই যেন ছাগলটার সেই দ্বিধার ভাবটা গেল কেটে। একবার মুখ তুলে সামনে প্রতিমার দিকে চাইল, তারপর যা করল, একেবারে চরম।

সেইরকম ভাবে গটগট করে এগিয়ে গেল। তারপর হাঁড়িকাঠটার সামনে

গিয়ে পেছনের দুটো পায়ে ভর দিয়ে, সামনের দুটো একত্র করে সে যা দাঁড়ানো— প্রায় সেকেণ্ড দশ-বারো—তাকে হাত-জোড় করে দাঁড়ানো ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না; তারপরেই ব্যা-ব্যা দুটো শব্দ করে সেইরকম কপাল চেপে মাটিতে পড়া…যেন, এতেও যদি না শুনিস ত বল্, হাঁড়িকাঠ সামনেই আছে, নিজেই মাথাটা গলিয়ে দিই।

এবার যে একটা আওয়াজ উঠল তাতে "মা! মা!" ভিন্ন কিছুই আর স্পষ্ট ক'রে কানে আসে না। প্রেসিডেণ্ট লোকনাথবাবু আলাদা কয়েক জনের সঙ্গে পূজার বেদীর কাছে দাঁড়িয়েছিলেন ব'লে তাঁর আওয়াজটা স্পষ্ট। "মা! মা! সন্তানের অপরাধ হয়েছে!!" বলে তিনি কাঁপতে কাঁপতে সংজ্ঞা-রহিত হয়ে পড়ে গেলেন।

লুকাই নি, লুকাবও না, একটা যে একটু বিশৃঙ্খল হ'ল তার মধ্যে আমি ছাগলটার ক্ষুরের সামনে থেকে একটু মাটি খুঁটে নিয়েছিলাম; দিতেও যাচ্ছিলাম কপালে, এমন সময় নজর প'ড়ে গেল গেটের কাছে, ভলন্টিয়ারদের মধ্যে ভলন্টিয়ারের সার্জেন্ট গোবরা আমার দিকে মিট মিট করে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতটা কপালে না তুলে আস্তে আস্তে পকেটে পুরে ফেললাম।

পর'দন সকালে ইজিচেয়ার হ্যালান দিয়ে এই ব্যাপারটা নিয়েই নিজের মনে তোলপাড় করছি, মনে হচ্ছে একটা যেন ঠাহরও করেছি, এমন সময় গোবরা এসে কাঁচুমাচু হয়ে সামনে বসল।

বললাম—"কি রে, তুই আছিস মনে হচ্ছে এর মধ্যে। তা যোগাড় করলি কোথা থেকে ওটাকে?"

"মা ই জুগিয়ে দিলেন স্যার। এই থেকেই বোঝা যায়, পাঁঠায় তাঁর অরুচি ধ'রে গেছে, আর খেতে চান না, নৈলে সার্কাসে ছাগলের খেলা কতদিন থেকে ত দেখছি, কৈ, মাথায় আসেনি ত।…আর সাবাস ট্রেনিংও দিয়েছে বেটা! স্বচক্ষেই ত দেখলেন। অবিশ্যি খানিকটা আমাদের দরকার মাফিক খাপ খাইয়ে নিয়েছে—তা সেটা ওরা পারে স্যার; ধরুন, যে-ছেলেটা এম-এ পাস করেছে, সে যেমন কেরানী হতে পারবে, তেমনি প্রফেসারিও করতে পারবে ত। ছাগলটার হয়েছে তাই, তালিম ছিলই, দু'দিন খেটে একটু আমাদের যুগ্যি করে দিলে লোকটা…"

"তা'হলে সার্কাসেরই, না? কিন্তু ট্রেনার বা অ্যানিমেল-মাস্টার কাছে না থাকলে ত ওরা করতে পারে না কিছু।"

"ছিল স্যার, একটা চাষী গেরস্তর বেশে, মাথায় লাল গামছা বাঁধা, হাতে একটা ছোট্ট ছড়ি। বরাবর ছিল ছাগলটার সামনে-সামনে ভিড়ের মধ্যে। ঐ যে সামনে চেয়ে তন্ময় ভাব, সেটা ট্রেনারের ছড়ির দিকে নজর থাকবার জন্যেই ত। নৈলে ছাগলে গুণে এগারো-বার পা ফেলছে, কে কবে শুনেছে বলুন। একবারটি শেষের দিকে ছিল না, আলাদা হয়ে পড়েছিল ভিড়ের চাপে, তাইতে মামলা প্রায় কাঁচিয়ে ফেলেছিল আর কি!"

"কখন্?"

"নজরে পড়েনি কারুর এতটা, আমি তখুনি ছুটে গিয়ে লোকটাকে গেট পার করিয়ে দিলাম কিনা খানিকটা ভিড়ের সঙ্গে। এই সবের জন্যেই ত এবার ঢুকেছিলাম ভলেন্টিয়ার হয়ে। নৈলে জানেনই ত, ছেড়েই দিয়েছিলাম সব সংস্রব।"

একটু চুপ ক'রে কুণ্ঠিত হয়ে মাথাটা নীচু করে বলল—"কিন্তু বড্ড খরচ পড়ে গেল স্যার, তাই ভাবলাম···"

"কত নিলে?"

"পার্টিটা বর্ধমানে খেলা দেখাচ্ছে, ও'দিক থেকে বেহারের দিকে চল যাবে। নিশ্চিন্দি। ট্রেনারটার সঙ্গে তিনদিনের চুক্তি ছিল—ভোরের গাড়িতে নেমে ওর শো দেখিয়ে আবার ফিরে যাবে; ভাড়া, একটা ভাতা, খাইখরচ হিসেবে, আর দিন পঁচিশ টাকা—তা মার দয়ায় দু'দিনেই কাজ হয়ে গেল। কিছু অবশ্য যোগাড় হয়েছে, তবু কু'ড়টে টাকা বাকি; পাঁচ কান করা যায়না ত।···ওকে অবিশ্যি সবটুকু দিয়েই বিদেয় করতে হয়েছে।"

এক জায়গায় একটু আটকাচ্ছে, এতবড় ব্যাপার, এত জানাজানি হয়ে গেল, শেষটা সামলাল কি করে গোবরা। প্রশ্নটা করতে গোবরা আরও যেন কাঁচুমাচু হয়ে উঠল; একটু হেসে বলল—"সেটা হ'ল ট্রেড-সিক্রেট স্যার, অবিশ্যি আপনার কাছে আর সিক্রেট কি? তবে যদি রাগ করেন, তাই···"

হেসেই বললাম—"রাগের কারণ ত আগেই যথেষ্ট হয়ে গিয়েছে গোবরা, কিন্তু করতে পারছি কৈ?"

হেসে, আর একটু মাথাটা নীচু ক'রে বলল—"ঐ জবার মালা স্যার।

দু'দিনের পাঁঠা একত্র হয়েছে—বারোটা, সব কুচকুচে কালো—ঐ জাতেরও খুঁজে পেতে গোটা তিনেক মিশিয়ে দিয়েছিলাম শেষের গোলমালটাতেও। গোবরার হাত ছিল স্যার—প্রেসিডেন্ট মা-মা ক'রে যখন জমি নিলেন—সেই গোলমালের মধ্যেই একটু হাতসাফাই দেখিয়ে মালাটা এ-গলা থেকে ও-গলা ক'রে দেওয়া··· বেচারী চাষী গেরস্ত নিজের পাঁঠা নিয়ে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কত অপরাধই হয়ে গেল স্যার, মা যে কী ভাবছেন জানি না!"

কার্জন পার্ক

ট্রাম ছাড়িয়ে পূর্বদিক থেকে কার্জন পার্কে প্রবেশ করতেই ডাইনে একটা কংক্রিটের বেঞ্চ পাওয়া যাবে। সন্ধ্যার পর, কলকাতার কাজ সারা হয়ে গেলে মাঝে মাঝে সেটাতে গিয়ে বসি।

কার্জন পার্কের আব সে-চেহারা নেই। প্রথমতঃ, বাংলার মতই সে দ্বিখণ্ডিত; অর্ধেকেরও বেশী ট্রাম কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, যেটুকু আছে তারও নেই আর পার্কেব মর্যাদা। তাব জন্য কিন্তু কার্জন পার্ককে দুঃখ করতে মানা করি; কলকাতায় আর কোন পার্কেরই মর্যাদা নেই। পার্ক যা আছে, কলকাতার গায়ে তা এখন বেমানান। কলকাতার রাগিণীতে পার্ক এখন বিসম্বাদী। তবুও গিয়ে বসি। এখনও এই সময়টা খোলা ময়দানের ওপর দিয়ে দক্ষিণা বাতাস বয়ে এসে কার্জন পার্কের ওপর তার শেষ উচ্ছ্বাসটা ছড়িয়ে দেয়। সে শুচি-শ্যামল দূর্বাঘাসের আস্তরণ নেই, সে যত্নলালিত ফুলের বেড নেই, সৌন্দর্যের প্রতি সে সভয় সমীহ নেই। সারা পার্কটায় কদর্যতার ভিড়, "ঝালচানা চাই···? চীনাবাদাম?"···তেলের শিশির গোছা হাতে ঝুলিয়ে "লক্ষৌকা নাই" হাঁকে—"মালিস! মালিস!" ··ওদিককার একটা ছোট দলের মধ্যে থেকে হয়ত একটা কুৎসিত বেনারসী বিদ্রূপই ভেসে এল অট্টহাস্যের সঙ্গে। যদি ফুটবলের সময় হ'ল ত কিছু বাঙালীর ছেলেও থাকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে—কার্জন পার্কের চলতি বুলির সঙ্গে মিশে যায়—ইষ্টবেঙ্গল, রাজস্থান, মোহনবাগান, মহমিডেন স্পোর্টিং··· এসব আমার ডানদিকে, আমার বেঞ্চ থেকে খানিকটা তফাতে; আমার বেঞ্চটা একটু সদরে পড়ে, ট্রামডিপোর আলোর মধ্যে, সুতরাং একটু নিরিবিলিতে।

নিরিবিলি অবশ্য সে অর্থে নয়। বেঞ্চটিতে লোক থাকে আমি ছাড়া দু'জন—কখনও বা তিনজনও; আসছে-যাচ্ছে খালি থাকতে দেখিনি কখনও।

আমার ডান দিকে এই। তারও ওদিকটায় কলকাতা আস্তে আস্তে গেছে মিলিয়ে। অন্ধকারে নয়, যদিও আলো এদিকের চেয়ে ওদিকে স্তিমিত,—মিলিয়ে গেছে দূরত্বে;—লাটভবনের উদ্যান, ক্যালকাটা মাঠ, ফোর্ট উইলিয়াম, গঙ্গা··· ওদিককার কলকাতায় যেন ধীরে ধীরে সব তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

একেবারে উল্ট আমার বাঁ দিকে। ভিড়ে বোঝাই ট্রামগাড়ি একটার পিঠে একটা সর্পিল গতিতে কপালে চোখ জ্বেলে আসছে, চলে যাচ্ছে। তার ওদিকে চৌরঙ্গী—আলোর মালায় ঝলমল; ট্রাম-বাস-মোটরে মাখামাখি, ভিড়ের জন্যে ফুটপাথে পা দেওয়া যায় না।

পেছনে আমার এস্‌প্ল্যানেডের রাস্তাটা; প্রায় তথৈবচ।

এই জটিল পরিবেশের মধ্যে আমার চিন্তারও কোন বাঁধুনি থাকে না। কখনও মনটা গঙ্গার ধারে গিয়ে ঝিমিয়ে প'ড়ে থাকে; কখনও চৌরঙ্গী এসপ্ল্যানেডের আবর্তে প'ড়ে হাবুডুবু খায়।

এই জায়গাটাকে বুঝলাম না আজ পর্যন্ত। বাংলার বুকের মাঝখানে থেকেও এ কখনও বাঙালী হতে পারল না। সেদিনকার চৌরঙ্গী, কলকাতার ফ্যাশান-স্বর্গ; শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সারি সারি বিলাতী দোকান, হোয়াইটওয়ে—হল-এণ্ডারসন—আর্মি-নেভী, কলকাতার বাছা-বাছা বিলাতী হোটেল—গ্র্যাণ্ড—ফারপো—সব বিলাতী হাতেই—মালিক বিলাতী, ক্রেতা বিলাতী। কলেজের প্রথম যুগের কথা মনে আছে, একটা জাগ্রত দেবতার মন্দিরে ঢুকতে যেমন ধুকপুকুনি হোত বুকের, চৌরঙ্গীর একটা দোকানে ঢুকতে তার চেয়ে হোত ঢের বেশী; যেখানেই দেখ, লালমুখ, ফুটপাথে পা দিতে পর্যন্ত সঙ্কোচ হোত, মনে হোত যেন অনধিকার প্রবেশ করছি।

চৌরঙ্গী ছিল বাংলার মাটির ওপর, কিন্তু বিলাতের যে কোন বড় শহরের মাঝখানে বসিয়ে দিলেও বেমানান হোত না!

আছেও বাংলার মাটির ওপরই আজ, বিলাতীরাও বিলাত চলে গেছে; আজও কিন্তু চৌরঙ্গী বাঙালী হতে পারল না···কেন এমনটা হয়?

আমার বেঞ্চটায় আগন্তুকদের যাওয়া আসা লেগে থাকে। কেউ আমার মত নিজের চিন্তা নিয়ে বসে থাকে, কেউ আবার একটু আলাপচারী, গল্প জমিয়ে তোলে। সেদিন একজন এই গোছের বৃদ্ধ এসে পাশে বসলেন, এবং আমার মনটা চৌরঙ্গী-রহস্য নিয়ে পড়েছিল বলে, কখন কি-ভাবে আলাপটা ঐ পথ ধরেই অগ্রসর হ'ল।

বৃদ্ধ বললেন—"আপনি এমনভাবে বলছেন, যেন চৌরঙ্গীর ওপর পুরাকালের কোন মুনি-ঋষির শাপ আছে—তুই ঘরে থেকেও কখনও ঘরের জিনিস হতে পারবি নি, যেমন নাকি শোনা যায় কোন কোন পাহাড়, নদী, সাগর, হ্রদের ওপর

থাকত। আসল কথা ত তা নয়, বাঙালী ওকে বাংলার রূপ দেবে না, করে নেবে না। ঘরের জিনিস ত চৌরঙ্গী করবে কি? স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে একটা মস্ত বড় সুযোগ ত এসেছিল, কিন্তু বাঙালী যদি সে সুযোগটা না নিতে চায় ত চৌরঙ্গীর দোষ কি? তাকে যে এসে নিজের সাজে সাজাতে চেয়েছে তার সাজেই সেজেছে।"

আমি অবশ্য মুনি-ঋষির শাপের কথা ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম না, তবু ভদ্রলোককে একটু বেশী রকম প্রাদেশিক ভাবাপন্ন মনে হওয়ায়, ইন্ধন না জুগিয়ে বললাম—"তবু একটা সান্ত্বনা ত থেকেই যায় সে ভারতীয় রূপ ত নিয়েছেই।"

বললেন—"বাঙালী হলে ভারতীয় হোত না বলতে চান?"

বললাম—"তা কেন বলব?—তবে রাজস্থানী, বোম্বাই, কিম্বা পাঞ্জাবী—সে রূপই নিক, সেটা ভারতীয় রূপই। হয় ত এই করে—অর্থাৎ বাংলার বম্বের রূপ এসে পড়ে, মাদ্রাজে পাঞ্জাবের রূপের খানিকটা গিয়ে পড়ে, আসামে খানিকটা মাদ্রাজের রূপ আমদানি হয়ে…"

"আপনার বক্তব্যটা বোধ হয় বুঝেছি"—একটু অসহিষ্ণু হয়েই আমায় থামিয়ে দিলেন বৃদ্ধ—"আপনি বোধ হয় বলতে চান এই করে সারা ভারতের এক সময় একটা নূতন রূপ ফুটে উঠবে, সেটা হবে খাঁটি ভারতীয় রূপ। বেশ ভাল কথা। কিন্তু তা'হলে বম্বে বা মাদ্রাজে অথবা পাঞ্জাবে বাংলার রূপও ত খানিকটা ফোটা দরকার। নাম করুন কোনও জায়গার কোনও একটুখানি কোণ—আহমেদাবাদ—মাড়ুবা—বাঙ্গালোর—কানপুর—অমৃতসর—যোধপুর—নাম করুন…"

বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। উনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছেন, সে হিসাবে না হলেও হয়ত নাম করা যায় দু'একটা; কিন্তু তাতে কিছু ফল হবে না। শুধু তর্কের ভাবটা এসে প'ড়ে ওঁর উত্তেজনাটা বেড়ে যাবে মাত্র। উনিও নিশ্চয় আমারই মত কার্জন পার্কের মুক্ত দক্ষিণা হাওয়ার লোভে এসে বসেছেন, সুতরাং এটাকে উত্তপ্ত করে না তুলে আমি আলাপের গতিটা ওঁরই অনুকূল করে দেওয়ার জন্য বললাম—"আপনি নিশ্চয় বাঙালীর ব্যবসা-বিমুখতার কথা বলছেন।"

বললেন—"আমার অভিযোগটা আরও ব্যাপক। বাঙালী যে নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না, কোন দিক দিয়েই আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারছে না, তার আসল কারণ ব্যবসা-বিমুখতা বলার চেয়ে শ্রমবিমুখতা বলাই ঠিক। চৌরঙ্গী-এসপ্ল্যানেড কার্জন-পার্কের এই কেন্দ্রটুকুর কথাই ধরা যাক না—এখানকার এই বিশিষ্ট রূপটি

যারা ফুটিয়েছে তারা শুধু ব্যবসা দিয়েই ফোটায় নি। অত ডিটেলের দিকে যাব না, যাওয়ার দরকারও নেই। এই পার্কের মধ্যে যারা ব'সে, গড়িয়ে, আড্ডা দিচ্ছে, কিম্বা পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে—একা একা বা দল বেঁধে—স্বীকার করি ভ্যাগাবণ্ডও আছে—কিন্তু যদি খোঁজ নেন ত দেখবেন তারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রকারের পরিশ্রম করে—সে ক্ষেত্রের মধ্যে গঙ্গা আছে, ময়দান আছে, চৌরঙ্গী আছে, রাজভবন আছে—খালাসী আছে, কুলি আছে, কনডাক্টার আছে, ঝালচানাওলা আছে। একটু ভাল ক'রে খুঁজে-পেতে দেখলে দু'একজন ভাটিয়া স্পেকুলেটারও হয়ত পেতে পারেন। বাঙালীর ছেলেও আছে—থাকে এই সময়টা ছড়িয়ে কিছু কিছু—চায়না বা সোভিয়েটের খবর দেবে শুধু তাই বা বলি কেন?—স্পেকুলেটারও পাবেন—লীগটা কে নেবে এবার, ছক্কেটে ব'লে দেবে আপনাকে···"

আবার উত্তেজিত হয়ে উঠেন। বললাম—"হ্যাঁ, শ্রমবিমুখতাই বৈকি। নানা সমস্যার মধ্যে প'ড়ে, বিশেষ ক'রে দেশের যুবসম্প্রদায় যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছে—একটা নৈরাশ্য—একটা সেন্স অফ ফ্রাসট্রেশান (Sense of frustration)··· কোন্ দিকে যাবে, কি করবে···"

এত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন হঠাৎ, যে আমায় ধমক দিয়েই উঠলেন—"ঐ বুলিগুলো থামান্ দিকিন মশাই আপনারা প্রৌঢ়-বৃদ্ধ সম্প্রদায়রা—ঐ সব বুলি আউড়ে আপনারা আস্কারা দিয়ে ওদের আরও মাথা খাচ্ছেন। শুধু ওদেরই বলি কেন—সমস্ত জাতটারই সবল সুস্থ চিন্তাধারাকে নষ্ট ক'রে দিচ্ছেন আপনারা। থামান ও বুলিগুলো।···কেন 'Frustration-এর কারণ আর কোন জাতের হয় নি? জাপান সামলে উঠছে; জার্মানি একবার সামলে উঠে বিশ্ব-ত্রাস হয়ে উঠেছিল, আবার কি হয়ে উঠবে বলা যায় না—এবার ত আবার দুটো Frustration-এর অভিজ্ঞতা। কেন, এই ভারতবর্ষেই আর কোনও জাতের Frustration-এর দশা উপস্থিত হয় নি?—পাঞ্জাব, সিন্ধু। আর সব কথা বাদ দিলেও শুধু পার্টিশনের প্রিন্‌সিপ্লেই ত সিন্ধুর খানিকটা জায়গা পাওয়া উচিত ছিল—কিন্তু Frustration-এর মুখে থাপ্পড় মেরে এরা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখুন।"

বললাম—"হ্যাঁ শক্তির পরিচয় দিচ্ছে বৈকি···"

"দেবেই। প্রাণ শক্তি রয়েছে যে।···কেন, আপনাদের জাতীয় জীবনেও

কি দুর্দিন এই প্রথম এল? একটা জাতের কাছে যা শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য—তার ধর্ম, তার সমাজ—যেতে বসেছিল না অতলে তলিয়ে?—বিপদ একভাবেই যে দেখা দেবে তার মানে কি?—Frustration এর করাল রূপই ত, ভয় পেয়ে দিশেহারাই হয়েছিল কি বাঙালী? বলুন।"

বললাম—"ঐতিহাসিক সত্য, অস্বীকার করি কি ক'রে? এ কথাও মানতেই হয় যে আমরা বড়রাও ছেলেদের পথ দেখাতে পারছি না। হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি না। শ্রমবিমুখতাই যে আমাদের" একটু নরম হলেন মনে হ'ল। পকেট থেকে একটা টিনের কৌটো বের ক'রে একটা বিড়ি ধরাচ্ছিলেন, ঠোঁটে চেপে আমার কথায় বাধা দিয়ে বললেন—"ভেবে দেখেছি, বলি দাঁড়ান।"

ভাল ক'রে দুটো টান দিয়ে বললেন—"সেও ভেবে দেখেছি। শ্রমবিমুখতাই মূল দোষ, কিন্তু কোনও একটা বিশেষ কালে জাতির শ্রমটাকে কোন্ দিকে বিশেষ ক'রে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেটা ভেবে ঠিক করার ওপরই সব কিছু নির্ভর করে। যুগটা বৈশ্যযুগ, আর অনেকগুলি কারণেই বাংলা এখন সমস্ত উত্তর পূর্ব ভারতের বৈশ্যকেন্দ্র—এখন জাতের উদ্ধারের পথ, উন্নতির পথ একমাত্র ব্যবসা—জীবনের আর সব চলুক সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু ব্যবসাটা যেন হয় আমাদের মূলমন্ত্র।'

বললাম—"মুশকিল হয়েছে—সমস্ত জাতটা একেবারে নিঃস্ব। কিছু রাজ জমিদার ছিল ·"

"গেছে, তাই দুঃখ?—তারাও বেচেছে বিশেষ ক'রে তাদের বংশধরেরা বেঁচে গেল।·· আপনি বোধ হয় মূলধনের কথা বলছিলেন। Essential নয়, বিড়লার পূর্বপুরুষের দরকার হয় নি। বিড়ির দোকান করুক, মুড়ি ফেরি ক'রে মূলধন করুক—করেছে, এই বাংলাতেই। একটি ছোট্ট উপাখ্যান বলি—সত্যিই, তবে উপাখ্যান কেন বলছি শুনলেই বুঝতে পারবেন। এই বিড়ির কৌটোটা দেখছেন; পাড়ার একটি ছেলেকে বসিয়েছিলাম—সেই খালি হ'লে ভর্তি ক'রে দেয়। বছর তিনেক হয়েছে—এখন সে ও তল্লাটটার বিড়ি কিং·· ক্রমে অন্য দিকে নজর দেওয়ার অবস্থা হয়ে আসছে। এই সেদিন আমি কৌটোটা পাঠিয়ে দিতে, ওটা রেখে দিয়ে একটা 'গোল্ড ফ্লেকে'র টিন পাঠিয়ে দিলে। বলে পাঠালে এবার থেকে রোজ একটিন সকালেই দেবে পাঠিয়ে· নিজেই চলে গেলাম,

বললাম—সিগারেট সেই স্বদেশী যুগে ছেড়েছি। আবার না হয় ধরব, কেননা ছেড়েছি বটে, তবে প্রতিজ্ঞা ক'রে নয়, ওটা করি না আমি। তবে ধরব যখন তোমার নিজের সিগারেট ফ্যাক্টারি হবে…"

আর সেই উত্তেজনার ভাবটা মোটেই নেই। আমার দিকে চেয়ে বলছেন, মুখটাতে একটা প্রসন্নতার আলো ফুটে উঠেছে, তার ওপর ট্রাম ডিপোর আলো পড়ে আরও দেখাচ্ছে অদ্ভুত। একটু যেন লজ্জিতও, কেন ঠিক বুঝলাম না, আমার দিকে একটা বিড়ি বাড়িয়ে ধরে বললেন—"দেখবেন? করছেও বেশ ভাল।"

নিয়ে কপালে ঠেকালাম, বললাম—"আমার আশীর্বাদটাও তাকে দেবেন—অর্থাৎ যেন আপনার আশীর্বাদটা ফলে তার জীবনে।"

আমার আজকের কার্জন পার্কের রাত্রিটি যদি এইখানে শেষ হ'ত ত ভালই হ'ত; কিন্তু তা হ'ল না।

আমার বেঞ্চে আর কেউ ছিল না। একটি যুবক একটু দূরে ঘাসের উপর উল্ট দিকে মুখ ক'রে বসে সিগারেট টানছিল, ভদ্রলোক উঠে গেলে একটু সঙ্কুচিতভাবে উঠে এসে যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল—সিগারেট-সুদ্ধই করতে যাচ্ছিল, কি ভেবে ফেলেই দিল সেটা, তারপর আস্তে আস্তে একটু দূরত্ব রেখে বেঞ্চটাতে বসল। বছর কুড়ি-একুশ বয়স হবে, চেহারাটা একটু পাকাটে হলেও ভদ্রতার ছাপ আছে। তবে মুখের বুলি…তার নমুনাই নীচে পাওয়া যাবে কতক কতক।

ভাবটা যেন একটু চর্নমনে, নমস্কারও করল সমীহ ক'রে, এরপর বার দুই ঘাড়টা ঘুরিয়ে চাইলেও দেখে আমি প্রশ্ন করলাম—"কিছু কি বলবে আমার?"

"নাঃ, এমন আর কি?…"

তারপর একটু বিরতি দিয়ে নিজে হতেই বলল—"উনি যে ব্যবসা করার কথা বলছিলেন স্যার, আর আপনিও যে হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন…"

"চাও নাকি ব্যবসা করতে?"—বেশ একটু উৎসাহিত হয়েই প্রশ্নটা করলাম, ঐ আলোচনাই সত্য হয়ে গেল ত।

কার্জন পার্ক

"ব্যবসার কথাই ভাবছিলাম স্যার, আমি আর আমার ফ্রেণ্ড মিলে—এই চৌরঙ্গীতেই—ব্রিষ্টলের গায়েই একটা ছোট্ট ষ্টল আছে—সিগারেট, সিজার; আমরা তার সঙ্গে বিড়িও রাখব, সব রকম খদ্দের আছে ত—একটা ভাটিয়ার দোকান, সে গুডউইল বেচে দিতে চায়—তা বাবা মোটে টাকা দিতে চান না···"

"তাঁর ইচ্ছে নয় যে তুমি ব্যবসা করো ?"

"ব্যবসা ছাড়া অন্য কিছু করতেই দেবেন না আমায়, আমাদের নিজেদেব ব্যবসা আছে কিনা······"

"তাতে তোমায় নেন না ?"—বিস্মিতভাবেই প্রশ্ন করলাম, দৃষ্টিটাও আমার যেন আপনা হতেই ওর চেহারার ওপর বুলিয়ে গেল। ছোকরা বেশ সহজভাবেই বলল—"নেবেন না কি বলছেন আপনি ?—অন্য ব্যবসা করতেই দেবেন না। আমাদের হচ্ছে গালাব ব্যবসা—হেড অফিস কলকাতাতেই—তবে কালেকশন ত বাইরেই—জঙ্গলে, পাহাড়ে—এদানি গুলটিতে একটা ডিপো খুলেছেন। বলেছেন, তুই সেখানে যা···"

প্রশ্ন করলাম—"চাওনা যেতে ?"

"হাজাবিবাগ থেকে বিশ মাইল! জঙ্গলেব মধ্যে নয় যদিও, গ্রামই, কালেক্ট ক'রে জমা করবে সেখানে, কিন্তু সে অজ পাড়াগাঁ, সিনেমা বায়স্কোপের কথা ছেড়ে দিন, একটা যে···"

"আর এখানে একেবারে পাশেই মেট্রো, মাথার ওপরই হোটেল কি বল ?"

একটু হকচকিয়ে গেল, তখনই সামলে নিযে বলল—"কি বলছেন আপনি স্যার, হাতে একটা ব্যবসা নিয়েছি, আব মেট্রোর অষ্টপ্রহব পড়ে থাকব !···তা দেখুন, বাবা কোনমতেই টাকা ছাড়বেন না। তাই—আপনি ঐ যে বলছিলেন—পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—যদি একটু সাহায্য করতেন···"

"পুঁজি দিয়ে ?"

জিহ্বা আর তালু দিয়ে 'চকচক' ক'রে দুটো আওয়াজ ক'রে বলল—"এমন অসম্ভব আবদার করব কেন স্যার, আপনি কেন পুঁজি দিতে যাবেন ?···আজই আমাতে আর আমার ফ্রেণ্ডে এক মতলব বের করেছি—আপনাদের মতন কেউ যদি মাঝখানে দাঁড়াতেন ত পুঁজিটা আপ্‌সে বেরিয়ে আঁসত বাবার হাত থেকে; ও ব্যাটা হাজার তিনেক চাইছে, বেশী নয়···"

"মতলবটা কি তা জানতে পারি ?"

"চুরিও নয়, চামারিও নয়, স্যার ; মনের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এমন কিছু মিথ্যা কথাও নয়। ঠিক করেছি নিরুদ্দেশ হব।"

"খাসা মতলব। তারপর ?"

"বাবা তাতেও গলবে না জানি ; কি ভয়ঙ্কর ধড়িবাজ জানেন না ত।"

একটু হেসে বললাম—"ছেলে দেখেও আন্দাজ হবে না ?"

একটু লজ্জিত হতে গিয়ে তখনি আবার সামলে নিয়ে ব'লে চলল—"ভরসা—মা। মা বাবাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে।···ফল, বিজ্ঞাপন—দুলাল, ফিরে এস, তোমার মা শয্যাধরা। অন্নজল ত্যাগ করেছেন।···চুপচাপ ; বুঝছি ত ভাঁওতা···"

"সত্যি হওয়াই বেশী সম্ভব নয় কি ?"

"তা'হলে ত আরও ভাল স্যার, সঙ্গে সঙ্গে কেল্লা ফতে। পরের বিজ্ঞাপনেই বাবার থার্মোমিটার সঙ্গে সঙ্গে নেমে যাবে—বাবা দুলাল, তুমি যা চাইছ পাবে।··· এই সময় আপনার মতন একজন ভদ্দরলোকের দরকার হবে।"

"কেন ?"

"একজনকে মধ্যস্থ হয়ে টাকাটা হাতে ক'রে নিতে হবে ত। বাবা যে একটা চাল দিচ্ছে না, কে জানে বলুন ?···"

একবার আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল—"আপনার বয়স হয়েছে, আর কি যে বলে, সামাজিক মর্যাদা আছে ব'লে মনে হচ্ছে···"

বললাম—"সম্ভব-অসম্ভবের কথা বাদ দিলাম ; কিন্তু মর্যাদার মতন কাজটা হবে মনে করো ?"

একেবারে হকচকিয়ে গিয়ে মুখের দিকে ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে রইল এবার।

রাগের চেয়ে দয়াই হয় বেশী, কতবড় সম্ভাবনা আর কোন্ পথ ধরে চলেছে ! ভাবলাম, কম বয়স, বুঝিয়েই বলি, যদি হয় কিছু ফল। আরম্ভই করতে যাচ্ছি। এমন সময় ঐ বয়সেরই একটি ছোকরা, যেন খুঁজছিল, হঠাৎ দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল—

"আরে, তুই এখানে ব'সে হাওয়া খাচ্ছিস ! আমি এদিকে গোরু-খোঁজা ক'রে বেড়াচ্ছি। ওঠ। কটা বেজেছে খোঁজ রাখিস ?"

কার্জন পার্ক

ছোকরা হন্তদন্ত হয়েই উঠে পড়ল, যেন কী একটা প্রকাণ্ড ভুল হয়ে যাচ্ছিল। দু'জনে চৌরঙ্গীর দিকে এগুল, গতি বেশ ক্ষিপ্র।

"কি হচ্ছিল কথা রে লোকটার সঙ্গে?"

"ছুৎ, বোগাস। শুধু মুখের ফুটানি—এই করব, সেই করব···"

একবার ঘুরেও চাইল। তারপর একটা ট্রাম এসে পড়াতে আড়াল পড়ে গেল।

মোহনবাগান

পাত্রের মাতা বরুণার পাত্রের পিতার ওপর একেবারে আস্থা নেই। বলল—"দেনা-পাওনা ঠিক করা সে তোমার কর্ম নয়, বাবার হাতে ছেড়ে দাও।"

কর্মী ব'লে খুব আত্মবিশ্বাস মহীনেরও নেই বোধ হয়, সেইজন্য আপত্তি করাটা আরও প্রয়োজন মনে করে থাকবে; বলল—"আবার তাঁকে এর মধ্যে জড়ানো কেন?

"অপদার্থ জামাই করেছেন যে।"

এ-খোঁটাটা চলছে ক'দিন থেকে, চলবে কিছুদিন এখন। কিছুদিন আগে মেয়ের বিবাহে লেন-দেনের ব্যাপারটা বড় কাঁচিয়ে ফেলেছিল, অনেকগুলি টাকা বের ক'রে দিতে হয়েছে। তবু কথায় হার মেনে নেওয়া চলে না ত; মহীন বলল—"তিনি ধার্মিক বিজ্ঞ মানুষ, ভুল করতে যাবেন কি—জেনে-শুনে?"

"করেছেন; এর চেয়ে বড় ভুল কেউ করে না···"

"বোধ হয় ভেবে দেখলেন—এ যা মেয়ে এর জন্যে এই জামাই-ই··"

বরুণাই চোখটা নাচিয়ে পূরণ করে দিল—"ঠিক—এই ত?·· তা বেশ ঠিক জামাই যা ঠিক মনে করেন করুন, মেয়ে আর এর মধ্যে···"

বলতে বলতেই ঘুরেছে, মহীন ধরে ফেলল বাঁ হাতটা, বলল—"আহা তা ব'লে একেবারে ত্যাগ ক'রে কি বাবার ভুলটা মেয়ে শোধরাবে? শোন না। বলছিলাম তিনি নেন হাতে, তার চেয়ে বড় কথা কি আছে? কিন্তু বুড়ো মানুষ এই জষ্টিমাসের রোদ মাথায় ক'রে সেই কোথা আসানসোল সেখান থেকে আনান··· প্রায়শ্চিত্তের বহরটা···নিজের মেয়ের পক্ষে···"

"সে-আক্কেল আছে মেয়ের"—টেম্পারেচারটা নামিয়ে এনে বলতে একটু দেরিই হ'ল। মহীন একটু যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল; বলল—"আক্কেল আছে শুনলে সত্যিই বড় আনন্দ হয়।···কি?"

হেসে ফেলতে হ'ল বলেও একটু দেরি হ'ল, তারপর বরুণা বলল—"নিজেই ত টিকিট কিনে রেখেছ, মনে নেই। শনিবারে চ্যারিটি ম্যাচ না? বাবা

ত আসছেনই। এঁদের বুধবার দিন আসতে মানা করে দিয়ে ঐদিনে আসতে বলো।"

"এই ত চমৎকার পরামর্শ।···শ্বশুরমশাই তা'হলে নিশ্চয় ভেবেছিলেন—মেয়ে আমার পরশপাথর, জামাইকে সোনা করে নেবে।"

বরুণা হাসিটা ঠোঁটে চেপে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—"হয়েছে।"

ঐ ঠিক হ'ল। একটা চিঠিও লিখে দেওয়া হবে।

শনিবার দিন সকালে প্রিয়নাথ এসে উপস্থিত হলেন। মোটাসোটা গৌরবর্ণ সদানন্দ পুরুষ, বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে, মাথায় একগাছি কাঁচা চুল নেই। ট্যাক্সি থেকে নেমেই জামাইকে প্রথম প্রশ্ন—"টিকিটটা তা'হলে হয়ে গেছে কেমন? কি রকম প্রস্‌পেক্ট দেখছ এবার?"

মহীন একটু লজ্জিতভাবে বলল—"সবাই ত বলছে এদেরই চান্স্—নাকি ফরম্‌টা এবারে খুবই ভালো···"

"নাকি—নয়, ভালোই; বেশ ভালো; বরাবর ফলো করে আসছি ত···"

চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে গেছেন।

"তা যদি বললে ত ফরম্ সেই নাইন্‌টিন ইলেভ্‌ন থেকেই কোনবারে খারাপ নয়—দোষ হয়েছে ঐখানে—নতুন এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করব। আরে কী (Key) ম্যাচগুলোতে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট চলে?···কোথায় চললে তুমি হঠাৎ ওরকম করে?"

মহীন বলল—"ট্যাক্সিটাকে বিদায় ক'রে···"

"ও! ঠিক ত। তা তুমি দেবে!···বাপ ডেঁড়েমুশে নিয়েছিল, তুমি একটু ট্যাক্সিভাড়া দিয়ে তার কতটুকু শুধবে বাবাজী?·· হাঃ, হাঃ, হাঃ···"

ব্যাগ খুলে ভাড়াটা দিয়ে—পূর্ব প্রসঙ্গের জের ধরেই গল্প করতে করতে ভেতরে চলে গেলেন। জমা-জুতা ছাড়া, হাত পা ধোওয়া, চা-জলযোগ—সবটুকুর মধ্যে দিয়ে ঐ আলোচনাই চলল—প্রায় এক তরফা অবশ্য। কোন্ বারে কি রকম চান্স্ ছিল, কি ক'রে নষ্ট করেছে—রেফারির একচোখামিতে, কি নিজেদের অপরিণাম-দর্শিতায়—সেই এগারো সালের পর থেকে—তার মধ্যেও যেগুলা আবার গৌরবের বৎসর—কখনও রাগ, অভিশাপ, কখনও উৎফুল্লতা, আশীর্বাদ—এক নাগাড়ে বকে চলেছেন প্রিয়নাথ। মেয়ে মুখে একটু হাসি নিয়ে নিজের কাজে ঘুরছে ফিরছে; বসতেও হচ্ছে এসে মাঝে মাঝে। বাপ চায় না এর মধ্যে অন্য

কথা এসে পড়ুক, মেয়েও চায় না এই অনাবিল আনন্দ-প্রস্রবণে কোন বাধা দিতে। সেই এক কথা, একভাবে বলা—জ্ঞান হয়ে অবধি শুনে আসছে, তবু এসে বসে—অনেক নাম জানা, বাবার "হীরো" সব; অনেক ঘটনা মুখস্থ, মাঝে মাঝে এনেও ফেলে তার এক আধটা। আনন্দের স্রোতে একটা আলোড়ন ওঠে, প্রিয়নাথ জামাইকে উদ্দেশ করে বলেন—"ঐ শোন, বোরু পর্যন্ত জানে সেসব! সেন্‌সেশন্যাল ব্যাপার সে! সারা বাংলাদেশ জুড়ে ঐ কথা তখন!"

আহারের আগে পর্যন্ত অন্য কথা তোলা গেল না। শেষ হ'লে গড়গড়ার নলটা হাতে দিয়ে বরুণা বলল—"বাবা আজ সমরের বিয়ের কথাবার্তাটা পাকা করতে আসবেন ওঁরা; চিঠিটা ত পেয়েছ?"

প্রিয়নাথ নলটা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে বললেন—"সেই কথাই ত বলব বলব করছি তখন থেকে। তা হ্যাঁরে, আমি কোথায় ভাবলাম ম্যাচটা না হয় দেখে আসি···"

মহীনের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে বললেন—"তোমরা আর একটা ম্যাচ আমার ঘাড়ে তুলে দিয়ে বসে আছ এদিকে! এ দায়িত্ব আমি···"

বরুণা বলল—"তোমার দায়িত্ব তুমি না নিলে কে নেবে বাবা? একটা দায়িত্ব ঠেলে দিয়েছিলে—তা দেখলে ত কি টাকার ছরকোটটা হ'ল?"

একটু কটাক্ষ হানল স্বামীর দিকে চেয়ে। প্রিয়নাথ বললেন—"ওটুকু ধরিস নি মা। কিছু বেশী গেলে মেয়ে যদি শ্বশুর শাশুড়ীর আশীর্বাদ মাথায় ক'রে বাড়িতে পা দেয় ত সে কথা আর ধরতে আছে?···ছেলেটি মনের মতন হলেই হ'ল। আমিই যে সাধ্যের অতীত ক'রে তোর শ্বশুরকে দিলাম, ছেলে মনের মতন পেলাম বলেই ত···"

স্বামী এবার স্ত্রীর কটাক্ষটা সুদে-আসলে ফিরিয়ে দিল। বরুণা যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে উত্তর করল—"নিশ্চয় ভেবেছিলে তাই। তা, সে কথা যাক্। এখন কথা হচ্ছে যেমন বেরিয়ে গেছে টাকা তেমনি যখন জো পেলাম সেই টাকাকে আবার সিন্ধুকে ফিরিয়ে আনতে হবে ত বাবা? সংসারের ত এই নিয়ম। নইলে তোমার তিনটি নাতনী—একটানা বেরিয়ে যাক যা-কিছু পুঁজি আছে···"

প্রিয়নাথ বললেন—"সে-কথা তুই একশবার বলতে পারিস। আমরা জো পেয়েছি আমরাই বা ছাড়ব কেন? গেরস্তকে আবার দু'দিকই দেখতে হবে ত। ···কি বল মহীন?"

মহীন ঘাড়টা নীচু করে বলল—"আজ্ঞে হ্যাঁ তা দেখতে হবে না?"

প্রিয়নাথ বাঁ হাতটা উল্টে একটু বাড়িয়ে ধরে বললেন—"কৈ, একটা ফিরিস্তি করে রেখেছ?···না রেখে থাক ত বোস' কাগজ-কলম নিয়ে; তুইও বোস্ খোকু; ওটা একটি একটি আইটেম ধরে তোয়ের থাকা চাই, নাকের সামনে ফেলে দিতে হবে—এই এই বাবদ এই এই দরকার আমাদের মশাই, পারেন, এগুন, নৈলে···কৈ, করেছ ফিরিস্তি একটা?"

বরুণা ক্যাশবাক্স খুলে বেশ ভালো ক'রে ভাঁজ করা একটা তালিকা দু'বার কপালে ঠেকিয়ে বাপের হাতে দিল। প্রিয়নাথ এক হাতে খোলবার একটু চেষ্টা ক'রে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—"তুই-ই পড়, শুনি।"

বরুণা পড়ে যেতে লাগল—

ওঁ সিদ্ধি

১। নগদ—দুই হাজার

২। বরাভরণ—এক হাজার

৩। গহনা—ত্রিশ ভরি—সাড়ে তিন হাজার

৪। শয্যাদ্রব্য ইত্যাদি···

প্রিয়নাথ গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে বের ক'রে উঁচিয়ে ধরলেন, বললেন—"আস্তে, অত তড়িঘড়ি ক'রে পড়ে গেলে চলে? ভেবে দেখতে হবে ত।··· নগদ তিন হাজার, বরাভরণ এক হাজার পাঁচ শ', গহনা পঁয়ত্রিশ ভরি···। ছেলে মানুষের মতন ফিরিস্তি হয়েছে যে, অবিশ্যি দুনিয়াকে চেনবার আর সময় পেলে কৈ?···তুমি তিন হাজার চাইলে তারা হাতে-পায়ে ধরবে না? তার জন্যে ঐ হাজারখানেক বেশী ধরা রইল। টানাটানি করতে করতে শ'পাঁচেক আরও এসে যায় ভালোই, নৈলে হকের তিন হাজারটা ত বজায় রইল।"

জামাইয়ের দিকে ঘাড়টা উল্টে একটু হেসে বললেন—"এই হচ্ছে নিয়ম।"

কন্যা পিতৃগৌরবে একটু রাঙাই হয়ে উঠেছিল, স্বামীর দিক থেকে চকিত দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে এনে বলল—"এইজন্যেই ত বললাম বাবা যে তুমি যখন আসছই শনিবার, সেইদিনই কথাবার্তা কওয়া হোক! আর যা ফিরিস্তি হয়েছে তাই আদায় করবার ক্ষ্যামতা আছে নাকি? না বিশ্বাস হয় তুমি হাতে দিয়ে সরে দাঁড়িয়ে তামাসাটা দেখ না।"

প্রিয়নাথ শুধু একটু হাসলেন। একুনে ন'হাজার ধরা হয়েছিল সেটাকে

সাড়ে এগার হাজার করা হ'ল। টানা-ছেঁড়া করেও হাজার দশেক ঘরে উঠবে এমন আশা করা যায়।

শুভ কাজ, দুটো থেকে সময় ঠিক হয়েছে পাঁজি দেখে। প্রিয়নাথ একটু আরাম করে নিতে গেলেন।

কন্যার পিতা নিখিলনাথ দুটোর সময়ই এসে বৈঠকখানায় মহীনের সঙ্গে গল্প-গুজব করছিলেন। শ্বশুর দৈবাৎ এসে পড়েছেন, আসল কথাটা তাঁর সাক্ষাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে ঠেকিয়ে রেখেছে মহীন। ভদ্রলোক মহীনের প্রায় সমবয়সী। একে কন্যার পিতা, তায় স্বভাবতই একটু নরম ধাতের মানুষ, সমবয়সী ভাবী বেহাইয়ের সঙ্গে তবু এতদিন এক রকম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কথাবার্তার মধ্যে শ্বশুর নামছেন শুনে বেশ একটু দমে গেছেন।

প্রায় আড়াইটার সময় ছোঁড়া চাকরটা গড়গড়া সেজে ইজি চেয়ারটার পাশে রেখে গেল, নলটা চেয়ারের হাতলে লটকে দিয়ে। তার পরেই প্রিয়নাথ মন্থর গতিতে এসে উপস্থিত হলেন। একে ভারী মুখ তায় দিবা-নিদ্রার পর আরও থমথমে হয়ে উঠেছে, দেখেই নিখিলনাথের বুকটা যেন এক ধাপ ধ'সে গেল। উঠে নমস্কার করতে প্রিয়নাথ অপাঙ্গে চেয়ে মৃদু হেসে মাথাটা একটু ঝোঁকালেন, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে নলটা তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—"আপনিই তা'হলে মেয়ের বাপ? মহীনেরই বয়সী দেখছি ত। বেশ, বেশ হবে।"

নিখিলনাথ হাত দুটো জোড় করে একটু বিনয়ের হাসি হেসে বললেন—"যোগাযোগ এখন ত আপনারই হাতে।...আমায় 'আপনি' বলবেন না। মহীনবাবুর চেয়ে যাঁহাতক ছোটই হব একটু। সম্বন্ধে ত বটেই..."

প্রিয়নাথ একটু হেসে নলটা সরিয়ে নিলেন মুখ থেকে। বললেন—"তা কি হয়? আপনি হলেন দাতা, মহীন হ'ল গ্রহীতা। গ্রহীতা দাতার চেয়ে কি বড় হয়েছে কখনও? আপনিই বলুন না।...আর যোগাযোগের কথা,—সেও ত আপনারই হাতে, নয় কি?"

'তুমি' না বলবার জন্য যেন আরও বেশী ক'রে 'আপনি'র ওপর জোর দিলেন দুবার। নিখিলনাথ একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে মাথাটা নীচু করলেন।...যেন একটু থাবাই খেলেন বেশী আত্মীয়তা করতে গিয়ে। বুকটা আরও একটু গেল নেমে। প্রিয়নাথ জামাইকে প্রশ্ন করলেন—"নিখিলনাথবাবুকে ফর্দটা দেখিয়েছ মহীন?"

"না, এই নিয়ে আসি"—ব'লে মহীন ভেতরে চলে গেল। বরুণা পর্দার পাশেই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, দেরি হ'ল না। শ্বশুরের হাতে দিতে যাচ্ছিল, প্রিয়নাথ বললেন—"ওঁকে দাও, এখন ত ওঁরই হাতে।"

ফর্দ হাতে ক'রে নিখিলনাথ একেবারে কাঠ হয়ে গেলেন। অনেক চেষ্টা করে তবুও যে নিষ্প্রভ হাসিটুকু বাঁচিয়ে রেখেছিলেন—কথাবার্তায় প্রয়োজন বলে, সেটুকু পর্যন্ত নিবে গিয়ে মুখটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল। ঠায় ফর্দটার দিকে দৃষ্টি নামিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। সমস্ত ঘরটায় এক গড়গড়ার আওয়াজ ভিন্ন অন্য কোন আওয়াজ নেই।

বেশ অনেকক্ষণই কেটে গেল। নিখিলনাথ যে কি ক'রে কোথা থেকে আরম্ভ করবেন যেন বুঝে উঠতে পারছেন না। প্রিয়নাথের গড়গড়া একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে; টানটা ক্রমেই যাচ্ছে দ্রুত হয়ে।

অবশেষে তিনিই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন—

"মহীন, একবার দেখো ভিতরে গিয়ে, নিখিলনাথবাবুর চায়ের ব্যবস্থাটুকু হ'ল কিনা…"

নিখিলনাথ মুখ তুলতে তাঁকেই বললেন—"আমার আবার একটু বেরুতে হবে; বুড়ো বয়সে একটু পাগলামি আছে…"

মহীন ভেতরে চলে গেল।

ঘুরিয়ে একটু তাগাদাই ত, কি একটা বলতে গিয়ে মুখের দিকে চাইতেই নিখিলনাথ যেন একটু আশ্চর্য হয়ে গেলেন, মনে হ'ল অমন যে গম্ভীর নির্বিকার মুখ তাতে হঠাৎ যেন কি একটা ফুটে উঠেছে—অল্প একটু হাসির রেখা যেন; ভিতরে হঠাৎ একটা আনন্দের জোয়ার এলে সেটা নিঃসাড়ে ধীরে ধীরে ওঠে ফুটে। খুব অস্পষ্ট, কিন্তু চোখে পড়ে।…পা দুটো একটু একটু দুলছে। একটু ধাঁধা খেয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন গুলিয়ে ফেলেছেন নিখিলনাথ; প্রিয়নাথ ভেতর দিকেই মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—"কিক্ অফটা (kick off) কখন্ রেখেছে মহীন আজ?"

মহীন বোধ হয় ভেতরের দিকে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কিছু কথা কইছিল, নিখিলনাথই বললেন—"আজকের চ্যারিটির কথা বলছেন?—চারটে পঁয়তাল্লিশ।"

ভাবটা আর একটু বদলাল প্রিয়নাথের, নলটা মুখ থেকে সরিয়ে একটু কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন—"আপনি রাখেন নাকি খবর?"

নিখিলনাথ কুণ্ঠিতভাবে মুখটা একটু তুলে বললেন—"আজ্ঞে, আছে একটু ইণ্টারেষ্ট্।"

প্রিয়নাথ একেবারে সোজা হয়ে বসলেন—"মানে?…কোন সাইডে?"

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠে তখনই কিন্তু যেন একটু নিবে গেল; প্রশ্নের গায়েই প্রশ্ন করে উঠলেন—"ইয়ে, আপনাদের বাড়ি খরিদপুরে না?…মহীন লিখেছিল তার চিঠিতে।"

নিখিলনাথ কি ভেবে একটু হেসেই ফেললেন, তাঁরও যেন ঠিক সেই দীন ভাবটা আর নেই; বললেন—"আজ্ঞে তাতে কি হয়েছে? খেলা খেলাই। আর আমাদের ত দু'পুরুষ কেটেও গেল কলকাতায়।"

বেশ যেন সোজাসুজি কথা কইবার যুক্তিটাও এসে গেছে মনে; হেসে, হয়তো একটু ইঙ্গিত করেই বললেন—"আর তা যদি বলছেন ত মোহনবাগানের অনেক বড় বড় নামকরা খেলোয়াড়ই ত আমাদের ওদিকেরই—ওদিকে ধরুন অভিলাষ, রাজেন, এদিকে এসে…"

"তা'হলে আপনি মোহনবাগানের দিকে! মাই গড্!…তা'হলে বোধ হয় আপনিও যাচ্ছেন দেখতে…টিকিট…"

নলটা বের করে নিয়েছেন, রীতিমত কাঁপছে হাত।

নিখিলনাথ বললেন—"যেতেই হবে।…টিকিটের বখেরা নেই ত, একটা পাশ পাই; ভাগ্নে খেলছে কিনা…"

প্রিয়নাথের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে, সামনে যেন কি এক অপূর্ব জিনিস দেখছেন, বিশ্বাসই করতে পারছেন না। কিছুক্ষণ একেবারে স্তব্ধ হয়েই তারপর বেশ চেঁচিয়েই ডেকে উঠলেন—"ওহে মহীন, শোন শোন কি আশ্চর্য যোগাযোগ! তোমার বেহাইও মোহনবাগানের দিকে!…"

মহীন আর বরুণা ঘরের মধ্যে এসে দুর্যোগ গুণছিল, মহীন—"তাই নাকি?" বলে একটু নিষ্প্রভভাবে বেরিয়ে এল।

প্রিয়নাথ ঘুরে চেয়ে বললেন—"তুমি ঐটুকুতেই আশ্চর্য হচ্ছ? আমাদের নিখিলের ভাগ্নে—আমাদের সমরের যে সম্বন্ধী হ'ল আর কি—সে মোহনবাগানের প্লেয়ার—আজ খেলছে!!…এ রকম যোগাযোগ ভাবতে পার?…কতদিন থেকে তোমার মোহনবাগানের সঙ্গে কনেকৃশন নিখিল?…আমার সে রকম বলতে ডিরেক্ট কনেকশন নেই কোন, তবে…"

নিখিলনাথ বললেন—"আজ্ঞে, এবার ত হ'ল···"

সে মানুষই নয় আর, হাসিতে মুখটা একেবারে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কোথায় গেল সে 'আপনি', কোথায় গেল সে সম্ভ্রম, প্রিয়নাথ মহীনকে সম্বোধন ক'রে বললেন—"শোন একবার নিখিলের কথা, বলে কনেকশন হ'ল—মোহনবাগানের সঙ্গে···তা মিছেই বা বলছে কি? নাতীর সম্বন্ধী খেলছে···"

মহীন একটু লজ্জিতভাবে হেসে বলল—"বরং সম্বন্ধটা আরও মিষ্টিই দাঁড়াল।"

"তা দাঁড়াল—তা দাঁড়াল বৈকি···"

—আনন্দে যেন শিশু হয়ে গেছেন। কি বলবেন, কি করবেন যে ভেবে উঠতে পারছেন না। বার দুই তিন মুখ থেকে নলটা টেনে নিলেন, কিন্তু কোন কথাই বের হ'ল না, শুধু শিশুর মতোই একটা অবোধ হাসি লেগে রইল মুখে।

তারপর আরম্ভ হ'ল সেই উনিশ শ' এগারো থেকে সমস্ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। কবে কি করে সুযোগ এগিয়ে এল, কি করে কার ভুলে, কার একচোখোমিতে নষ্ট হ'ল···আর, সে-সব কী টিম! সে সব কী খেলা!···গর্ডনরা হেডে হেডে নিয়ে গিয়ে একেবারে গোলের ভেতর—ডারহাম্ বাবাজীরা ত কুপোকাত হয়েছিলেন বম্বে রোভার্সের ফাইনালে—এক পশলা বৃষ্টি না হয়ে গেলে···

প্রিয়নাথ মুখটা বিকৃত ক'রে ওঠেন—কার যেন ছেলেমানুষী আব্দারের নকল ক'রে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন—'আমরা ওয়েট্ গ্রাউণ্ডে খেলতে পারি না!'··· তোমরা কচি খোকা!···কেন, আজ ত সেই বুট পরে খেলছিস···যদি গোড়া থেকে আরম্ভ করতিস ত এই কেলেঙ্কারির ওপর কেলেঙ্কারি ত করতে হ'ত না!···

খুব জমে ওঠে গল্প, এত আর মহীন আর বরুণা নয় যে এক তরফা চলবে। নিখিলনাথ সমানে জোগান দিয়ে যাচ্ছেন—খুব ইণ্টারেষ্ট, অনেক জানেন, অনেক দেখছেন, বছর-বছরের খুঁটিনাটি তথ্য দিয়ে যোগান দিয়ে যাচ্ছেন; একই রকম মত দু'জনের, যদিই বা কোনখানে কিছু প্রভেদ থাকেই ত মিলিয়ে দিয়েই যাচ্ছেন।

বরুণা দুর্যোগ গুণছে দোরের পেছনে দাঁড়িয়ে। বার তিনেক কড়া নাড়তে মহীন ভেতরে চলে গেল। ফিরে এসে গল্পের তোড়ের মুখে বার দুয়েক কিছুই বের করতে পারল না মুখ দিয়ে। তৃতীয় বার যখন এল তখন মোহনবাগান

চুয়ান্ন সালের শীল্ড জয় করে রোভার্সটাও তুলে নিয়েছে। দু'জনে বালকের মতো প্রাণখুলে সেই বাসি আনন্দের হাসি হেসে যাচ্ছেন। মহীন কুণ্ঠিতভাবে বসতে বসতে বলল—"ও বলছে, আপনারা আবার এখুনি বেরুবেন ত; এদিককার কথাটা তা'হলে…"

"ঠিক কথাই ত!"—প্রিয়নাথ সচকিত হয়ে উঠলেন; নিখিলনাথের হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"কটা বাজল?" তারপর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—"মোহনবাগানের কথা উঠলো ত তোমার দেখছি…"

হাসিই আছে, তবে তারই মধ্যে মনে হ'ল যেন একটু ব্যঙ্গও লেগে আছে কোথায়। নিখিলনাথ একটু অপ্রস্তুত হয়ে হাতটা উল্‌টে দেখে বললেন—"হয়েছে তিনটে বিয়াল্লিশ।…আজ্ঞে হ্যাঁ তা'হলে ফর্দটা…"

প্রিয়নাথ সোজা হয়ে বসেই সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। মহীনকেই বললেন—"তিনটে বিয়াল্লিশ হয়ে গেছে! তা'হলে আর সময় কোথায়? কি করছিলে তোমরা এতক্ষণ?…নাও ওঠো নিখিল, আর সময় কোথায় তা'হলে?…বোরু চাদরটা আমার…না হয় বেরুলিই সামনে, আর ত সম্বন্ধ হয়ে গেল। ফর্দর জন্যে বিয়ে আটকেছে কখনও?—আর এমন যোগাযোগ!…"

না, তা আর আটকাবে না। তবে আর নগদ তিন হাজার ত নয়ই, দু' হাজারও নয়, কাছাকাছিও নয় দু'হাজারের। একুনে এগারো হাজারের জায়গায় পাঁচটি হাজারও হয় কি না হয়।

বরুণা চাদরটা এনে পর্দার বাইরে হাতটা বাড়িয়ে ধরেছিল। এত নিরাশার মধ্যেও মহীন কি একটা বিজয়ের কটাক্ষই হানল তার দিকে চেয়ে?

আনন্দ-নট

দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী অহোরাত্র পরিশ্রমের পর দেবালয়ের নির্মাণকার্য সমাধা হ'ল। এইবার আনন্দ-নটের প্রতিষ্ঠা হবে। রাজজ্যোতিষী গ্রহসংস্থান বিচার ক'রে দিন এবং লগ্ন নির্ণয় করে দিয়েছেন, আজ থেকে সপ্তম দিনে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে দেবতার অভিষেক। রাজার আদেশে আজ থেকে অভিষেকের পরে এক সপ্তাহ পর্যন্ত এই পক্ষকালব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে নগরীতে। রাজভাণ্ডার অবারিত; পক্ষকাল ধরে রাজার রন্ধনশালায় ব্রাহ্মণদের জন্য সদাব্রতের ব্যবস্থা।

দিন যতই এগিয়ে যেতে লাগল নগরীর উৎসব-সমারোহ ততই যেতে লাগল বেড়ে। বাইরে থেকে সামন্তগণ আহূত হয়ে নগরের শোভা বর্ধিত করতে লাগলেন। মন্দিরে-মন্দিরে বেদপাঠ, শাস্ত্রালোচনা। অপর পক্ষে নগরের বিশিষ্ট-বিশিষ্ট স্থানে উৎসব-মঞ্চ নির্মাণ করে প্রজাদের চিত্তবিনোদনের জন্য নৃত্য-গীত-অভিনয়াদির ব্যবস্থা। আনন্দ-কলরোলের মধ্যে দিয়ে দিন এগুতে লাগল অভিষেক-প্রভাতের দিকে।

তারপর যখন একেবারে চরমে উঠে গেছে, সমস্ত উৎসব-চঞ্চলতা যেন অকস্মাৎ অশনি-সম্পাতে একেবারে হয়ে গেল স্তব্ধ।

আনন্দ-নটের বিগ্রহ প্রায় সম্পূর্ণ ই হয়ে গিয়েছিল। অভিষেকের আর মাত্র একটি দিন বাকি, রাজা বিগ্রহ-পরিদর্শনে এসেছেন, আজই বিগ্রহকে বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে। প্রধান ভাস্কর পুরন্দর হাতে একটা ছেদনী নিয়ে মূর্তিটির চারিদিকে ঘুরে ঘুরে শেষবারের মতো একবার পরীক্ষা করে নিচ্ছিলেন। দক্ষিণ বাহুমূলে এক জায়গায় একটু যেন অসামঞ্জস্য চোখে পড়ল। সামান্যই, তাও প্রচ্ছন্নই একরকম, তবু এতদিন ধরে অতন্দ্র তপস্যার মধ্যে গড়া নির্দোষ দেবমূর্তিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মও কোন ত্রুটি থাকে সেটা তাঁর সহ্য হ'ল না। খুব লঘু একটা হাতুড়ি নিয়ে ছেদনীর সাহায্যে তিনি সেটুকু সংশোধন করতে প্রবৃত্ত হলেন।

বেশী নয়, মাত্র কয়েকটি ঘা দিয়েছেন, ত্রুটিটুকু প্রায় সংশোধিত হয়ে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ একটি আঘাতে বাহুমূলে একটা বিদারণ রেখা দেখা দিল এবং

কিছু দেখবার বোঝবার আগেই নৃত্যচ্ছন্দে উৎক্ষিপ্ত হাতখানি আপন ভারে মূল ছিন্ন করে নেমে এল।

সঙ্গে সঙ্গে হাহাকার পড়ে গেল। অভিষেকের অব্যবহিত পূর্বে এরকম দুর্ঘটনা! প্রধান ভাস্করের অনবধানতাই এর কারণ, ব্যাপারটা এই ভাবেই প্রতিপাদিত হয়ে তাঁর প্রাণদণ্ডই ছিল এর পরিণাম। কিন্তু রাজার একেবারে দৃষ্টির নীচে সংঘটিত হওয়ায় আর ওভাবে নেওয়া গেল না।...একটা চরম অশুভের সূচনা; সুকঠিন কষ্টিপাথরের মূর্তি, নির্মীয়মান অবস্থায় কত রূঢ় আঘাত কাটিয়ে উঠে শেষ মুহূর্তে একটা নিতান্ত লঘু আঘাতে ভেঙে পড়ল। দেবতার অসন্তোষ ভিন্ন এমন ধরনের একটা অনর্থ ঘটতেই পারে না। কী অপরাধ হ'ল? কোথায় ব্যত্যয় ঘটেছে, কী অনাচার প্রবেশ করেছে রাজ্যে?

উৎসব-মুখর নগরী একটা দারুণ অমঙ্গলের আশঙ্কায় একেবারে নিথর নিস্পন্দ হয়ে পড়ল। রাত্রে রাজসভায় মন্ত্রী ও অমাত্যবৃন্দ উপস্থিত হয়ে বিচারে বসলেন।

ত্রুটি-বিচ্যুতির ত কোথাও কিছুই হয় নি। সমস্ত রাজপরিবার, সমস্ত পুরোহিত-সেবায়েৎ মণ্ডলী অভিষেকের জন্য এক সপ্তাহ ধরে শুদ্ধাচারে ব্রতাচরণ করে আসছেন, বৈদিকেরা অখণ্ড বেদাধ্যয়নে নিরত। দান-ধ্যানাদি পুণ্যানুষ্ঠান অব্যাহত গতিতেই সংসাধিত হয়ে এসেছে।

অন্য কোনবিধ অপরাধ কি অনুষ্ঠিত হয়েছে নগরী মধ্যে এই অভিষেক সপ্তাহে?—চৌর্য, দস্যুবৃত্তি, ব্যভিচার?

নগর-কোটাল এর উত্তর দিলেন।—নগরী উৎসবে মত্ত থাকলে দুর্বৃত্তেরা যে নিজ নিজ ব্যবসায়ে সক্রিয় হয়ে উঠবে এটা স্বাভাবিক জেনে তিনি তাঁর অনুচরবর্গ নিয়ে সবিশেষ সতর্ক ছিলেন। একেবারে যে কিছু হয়নি, এটা বললে একটা মিথ্যা দম্ভ করা হবে। সূত্রপাত হয়েছিল, কিন্তু লঘু অপরাধেও কয়েকটা অতি-গুরু দণ্ড দিয়ে সেটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেওয়া হয়, তারপর আর অশোভন কিছু ঘটবার অবসর পাননি।

অন্য কোন রকম প্রত্যবায়? অস্পৃশ্য চণ্ডালাদি ঘটিত কোন রকম অনাচার?

নগর-কোটালই দিলেন এর উত্তর।—অস্পৃশ্য চণ্ডালাদির দেহ-স্পৃষ্ট বায়ু যাতে মন্দির অশুচি না করে সেদিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর তৎপরতা ছিল। নগরের

প্রান্তে যেখানে তাদের পল্লী, অভিষেক পক্ষের জন্য, সেখান থেকে আরও ক্রোশদ্বয় দূরে তৃণাচ্ছাদিত নূতন আবাসস্থলে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নগর-কোটাল একটু চুপ করলেন, তারপর কণ্ঠে ক্রোধের আভাস দিয়ে বললেন —"তা সত্ত্বেও একটু অনাচারের সূত্রপাত হয় মহারাজ; ডাহুক নামে এক চণ্ডাল, বেশ পরিবর্তন করে প্রচ্ছন্নভাবে রাজকবি রচিত ভগবান আনন্দ-নটের অভিনয় দেখছিল। ধরা পড়ে যায়। তারও সমুচিত দণ্ডই দেওয়া হয়েছে, তার পক্ষে মৃত্যুর চেয়েও গুরুদণ্ড।"

প্রত্যাসন্ন অনিষ্টের আশঙ্কায় সমস্ত নগরী মূর্ছিত-প্রায় হয়ে পড়ে রইল। বিনিদ্র রজনীর শেষাংশে লঘু তন্দ্রার ঘোরে রাজা এক স্বপ্ন দেখলেন; অদ্ভুত সে স্বপ্ন। প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজাদেশে সভা আহূত হ'ল। মন্ত্রী, নগর-কোটাল ও অমাত্যগণ সমবেত হলে রাজা সর্ব-সমক্ষে আপনার অদ্ভুত স্বপ্ন-কাহিনী বর্ণনা করলেন—

ভগবান আনন্দ-নট এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর নট-মূর্তিতে, ভাস্কর পুরন্দর ঠিক যেমনটি করে তোয়ের করেছেন···হঠাৎ কোথা থেকে যেন দেবসভার বাদ্য-সঙ্গীতের সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল উঠল···সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-নটের নৃত্য হ'ল শুরু···তারপর রাগ-তালের সঙ্গে নৃত্যচ্ছন্দ যখন চরমে বিকশিত, দশদিক প্লাবিত করে আর সব অনুভূতিকে ভাসিয়ে যখন একটি অবিচ্ছিন্ন আনন্দের অনুভূতিই রয়েছে জেগে, হঠাৎ একটা দারুণ অনর্থ; মৃদঙ্গের বোল গেল স্তব্ধ হয়ে, কে যেন কঠিন অস্ত্রাঘাতে তার চর্মাবরণ ছিন্ন করে দিয়েছে; সমস্ত সঙ্গীত গেল থেমে, এবং সবচেয়ে যা বড় অনর্থ, নৃত্যপর আনন্দ-নট ছিন্নবাহু পাষাণ-পুত্তলি হয়েই গেলেন স্থাণু হয়ে।···এর পর আরও যা বিস্ময়কর, আনন্দ-নট আর নেই, তাঁর স্থানে তিনিই রূপান্তরিত হয়ে যেন একটি শিশুতে পরিণত হয়েছেন; নিরানন্দ, নিষ্প্রভ একটি শিশু, আকুল-অসহায়! পৃথিবীর সব আনন্দ যেন তার সুকুমার দৃষ্টি থেকে এক মুহূর্তে নিবে গিয়ে তাকে বিস্মিত বিমূঢ় করে দিয়েছে।

কাহিনী শ্রবণ ক'রে সভা স্তব্ধ হয়ে রইল। একটু পরে নগর-কোটাল ভঙ্গ করলেন সে স্তব্ধতা, প্রশ্ন করলেন—"মহারাজ, শিশুটি কি ধরণের যদি জানতে পেতাম···"

—"সেও এক অদ্ভুত ব্যাপার!"—রাজা বলে চললেন, "দেবতা রূপান্তরিত

হলেন সে কোন আর্য-শিশুতে নয়। কষ্টিপাথরেরই মতন কৃষ্ণবর্ণ এক অনার্য শিশু, একেবারেই নগ্ন, বেশভূষাহীন, শুধু কণ্ঠে সূত্রধৃত একটি ব্যাঘ্র-নখ তার ব্যাধ বা চণ্ডালত্ব সূচিত করছে, আর কটিদেশ ঘেরে রক্ত-কুঁচের মেখলা…”

নগর-কোটালের ললাটে স্বেদবিন্দু জমে উঠেছে! আবেগে তনু ঈষৎ কম্পিত, করজোড়ে নিবেদন করলেন—“মহারাজ, আমি চিনেছি এই দেব-শিশুকে।”

সমস্ত সভা বিস্মিত দৃষ্টি তুলে নগর-কোটালের মুখের উপর নিবদ্ধ করল। তিনি বলে যেতে লাগলেন—

“ছদ্মবেশী চণ্ডাল ডাহুকের কথা গোচর করেছি মহারাজের; কিন্তু কিভাবে সে ধৃত হয় তা অপ্রয়োজন বোধে মহারাজকে বলা হয় নি। ডাহুকের ছদ্মবেশ এতই কৌশলপূর্ণ ছিল যে, তাকে সেই প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে কোন মতেই আবিষ্কার করা যেত না যদি—তখন যা আনন্দ-নটের করুণা বলে মনে করেছিলাম—তার নিদর্শন না পেতাম…”

“সে কিরকম?” প্রশ্ন করলেন রাজা।

“ছদ্মবেশী ডাহুক তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে অভিনয় দেখছিল, অবশ্য নিজের মতো তাকেও ছদ্মবেশে আবৃত ক'রে। সে ছদ্মবেশকে ভেদ করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু শিশুর কণ্ঠকাকলিকে ত আবৃত করা যায় না। আনন্দ-নট রঙ্গমঞ্চে এসে যখন নৃত্যে বিভোর হয়ে উঠেছেন, শিশু হঠাৎ উল্লাসে করতালি দিয়ে তার অস্ফুট আধ-আধ-ভাষায় চিৎকার করে উঠল। চণ্ডালদের ভাষা, বিশেষ করে উল্লাসের আবেগে তারা যে অনার্য-ভাষা প্রয়োগ করে তা সম্পূর্ণ পৃথক। ডাহুক শিশুপুত্রসহ ধরা পড়ে গেল।”

“অতঃপর?”

“মহারাজের আদেশে অভিষেক-পক্ষে মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ, তাই অন্যবিধ এক কঠিনতম দণ্ড তাকে দেওয়া হয়েছে মহারাজ। যে-পুত্রের জন্য সে নগরীর বাতাস কলুষিত করে দেবানুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটাল, বৎসরাবধি কাল সে এবং তার পরিবারভুক্ত সকলে তার দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকবে। শিশুকে রাজ্যের অন্যত্র এক চণ্ডাল-পরিবারের তত্ত্বাবধানে রেখে উভয়ত্রই কঠিন প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।…আমি আনন্দ-নটের সন্তোষ বিধানের জন্যই এ-ব্যবস্থা করেছি মহারাজ; কিন্তু দেখছি অজ্ঞানতাবশতঃ আমি অসন্তোষ বিধানই করেছি তাঁর। আমি দণ্ডার্হ, মহারাজ তাঁর সন্তোষকল্পে যে-শাসন দেন আমি নতশিরে তার জন্য প্রস্তুত আছি।”

আনন্দ-নট

সভায় মন্ত্রী, অমাত্য, পুরোহিত, বৈদিক, দৈবজ্ঞ প্রভৃতি স্বপ্ন-বিচারে প্রবৃত্ত হলেন।···যিনি সর্বভূতের, আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ সর্বজাতির স্রষ্টা, তাঁর কাছে উচ্চনীচ কোথায়? শিশুর নিষ্কলঙ্ক, শুদ্ধ হৃদয় হ'ল আনন্দের পীঠস্থান, আনন্দময়ের আবাস সেখানেই, তাই চণ্ডাল-শিশুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি ওভাবে স্বপ্নে প্রকট করলেন নিজেকে; তাঁর আনন্দেই লীন হয়ে তাই না শিশুও নৃত্যোল্লাসে কণ্ঠকাকলি তুলেছিল!

নূতন দৃষ্টি খুলে গেল সবার। মহারাজ নগর-কোটালকে সম্বোধন করে বললেন—"তুমি দণ্ডনীয় হলে আমরা সকলেও ত দণ্ডনীয়,—যুগ যুগ ধরে ভেদাভেদের প্রাচীর তুলে তাঁর আনন্দকেই ত খণ্ডিত, বিঘ্নিত করে এসেছি। এসো, সম-দণ্ডভাগী আমরা সকলেই তার প্রায়শ্চিত্ত করি; মুক্ত হই আমাদের সঞ্চিত কলুষ থেকে।"

রাজাদেশে চণ্ডাল-পল্লীকে আর সব পল্লীর মতোই শ্রীসম্পন্ন ক'রে, সাম্যের সমাদরে তাদের দূর নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনা হ'ল।

যতদিন আনন্দ-নটের নূতন বিগ্রহ না সৃষ্ট হয়, ততদিন নগরী থাকবে উৎসব-লীন।

চণ্ডাল ডাহুক-পরিবারের স্থান আপাততঃ হ'ল রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে। সেখানে অন্য সব শিশুদের সঙ্গে ক্রীড়ারত ডাহুকের শিশুপুত্রের মুক্তচ্ছন্দ মূর্তি দৃষ্টিপথে রেখে ভাস্কর পুরন্দর শিশুরূপী আনন্দ-নটের মূর্তি গড়ে তুলবেন।

সান্ত্বনা

যত নষ্টের গোড়া মগডালের ঐ কামরাঙা ফলটি।

বাড়ির খিড়কির দিকে বেশ অনেকখানি দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা বাগান। মাঝখানে একটা পুকুর, তার চারিদিকে আম, জাম, নারকেল, সুপারির গাছ। কামরাঙার গাছটা ঘাটের এক পাশে।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। এ-বেলার পাট সেরে খাওয়াদাওয়া করে যে-যার ঘরে এখন। বাড়ি একেবারে নিষুতি; আওয়াজের মধ্যে ঠাকুরমার ঘর থেকে রামায়ণ পড়ার গুণগুণানি ভেসে আসছে মাঝে মাঝে, উঠানের মাঝে সকড়ি বাসন-কোসন ঘিরে কাকেদের গজালি। বেড়ালটা কোথা থেকে কি চুরি করে খেয়ে এসে খিড়কির দোরের চৌকাঠের ওপর বসে বাঁ হাতে মুখটা মুছে নিল; তার মানে বাড়ির ভেতর এখন নিশ্চিন্ত বিশ্রামের পালা।

এইটি কামরাঙা অভিযানের সময়। ওদিকে বেশ চলছিল, তারপর মাঝখানে রবিবার নিয়ে দিনচারেকের ছুটি যাওয়ায় বাবা-কাকা-দাদারা দুপুরে সবাই বাড়িতেই থাকত, সুবিধা হয় নি। তারপর কাল আবার কাকা গাছটা বিক্রি করে দিলে, ফোড়ে এসে সব ফল পাড়িয়ে নিয়ে গেল। আজ আর কামরাঙার লোভে আসা নয়, শোকে চোখের জল ফেলতে আসা বলা চলে।

ফোড়ে একেবারে মুড়িয়ে নিয়ে গেছে গাছটা; পাকা হলদে ফলে গাছটা যে অমন আলো করে রেখেছিল, তার একটাও নজরে পড়ে না। ঘুরে ঘুরে অনেক দেখল নীনা; না, একটাও নেই কোথাও। দাঁতে আঙুলের নখ খুঁটতে খুঁটতে ঘাটের বেঞ্চে এসে বসে পড়ল; পেছনে নূতন চালদা গাছটার একটা ছায়া পড়েছে।

অভিযানে ও একলা নয়, আরও আছে। গাছের ওপর থেকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে এসে তারই আসার প্রত্যাশায় নীনা মাঝে-মাঝে পুকুরের ওপারে চেয়ে চেয়ে দেখে নিচ্ছিল, সেখানে অর্ধচন্দ্রাকারে দেয়ালের খানিকটা ভেঙে গেছে। বীরু আসবে।

বীরুও নিত্য অভিযাত্রী একজন। আরও আছে, চন্দোর; কিন্তু বীরুর

মতো অমন মনে-প্রাণে নয়। কাল যখন ফোড়ে পাড়াচ্ছে কামরাঙাগুলা সে কী দৃষ্টি দিয়ে যে দাঁড়িয়েছিল বীরু, মনে হচ্ছিল নীনার মনের কথা যেন একটি একটি করে বুঝতে পেরেছে নিজের মনে। এমন যে, নীনার কামরাঙার চেয়ে ওরই জন্যে যেন আরও বেশি করে কষ্ট হচ্ছিল। চন্দোরও ছিল, কিন্তু অমন নয়। তার যেন কতকটা তামাশা দেখা গোছের, মাঝে মাঝে নীনার দিকে চেয়ে হাসতেও বাধে নি তার। সব সময় বেশ ভালোও লাগে না চন্দোরকে। নেহাৎ নাকি খেলার জুটী, তাই।···বীরুকে বড্ড ভালো লাগে নীনার। দু'চোখে খুঁজে পাচ্ছে না, বীরু এলে চারচোখে যদি পায়।

ওপারে অর্ধচন্দ্রের মাথায় বীরুর মুখটা ফুটে উঠল। তারপর সমস্তটা; তারপরই সে টুপ করে বাগানে লাফিয়ে পড়ল।

ঠিক এই সময় কামরাঙা গাছের মাথায় দুটো কাক উড়ে এসে ঝটাপটি লাগিয়ে দিলে। কাকে কামরাঙা খায় নাকি?···কামরাঙা খায় না এমন জীবও আছে নাকি?···নিজের প্রশ্ন আর নিজের উত্তরে নীনার চোখ দুটো আরও যেন সতর্ক হয়ে উঠেছে, তাইতেই নজর পড়ে গেল—ওদের ঝটাপটিতে যে গোটাকতক পাতা ঝরে পড়ল, তাতে সোনার মতো হলদে একটা টলটলে পাকা কামরাঙা বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

বীরু এসে পড়েছে। অনেকটা সান্ত্বনার স্বরে বলল—"মিছে খুঁজছিস, কাল একটা একটা করে তুলে নিয়ে গেছে ফোড়ে-ব্যাটা; দেখলুম ত দাঁড়িয়ে। মনে হচ্ছিল—যদি···"

দাঁতে দাঁতে পিষে একটা শব্দ করল।

নীনা বলল—"একটি আছে।"

"কই।"

"তাও একেবারে মগডালে।"

বীরু মাথাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল, বলল—"কই দেখতে পাচ্ছি না ত।"

"এই যে, সরে আয় না।"

টেনে নিয়ে পাশে বসিয়ে নিল নীনা, তারপর মাথায় মাথায় মিলিয়ে মাঝখান দিয়ে তর্জনীটা সন্তর্পণে তুলে নিয়ে বলল—"ঐ দেখ।"

মুখটা সরিয়ে নিয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে বলল বীরু—"পেকে টসটসে হয়ে রয়েছে! না রে?"

চন্দোরও পাঁচিল টপকে এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, প্রশ্ন করল—"আছে নাকি ?"

নীনাই উত্তর দিল—"একটি ; তাও একেবারে মগডালে।"

তারপর একটু লুব্ধভাবেই জুড়ে দিলে—"কিন্তু এবারকার মত এইটেই শেষ, না ভাই ?—তা একটিব জন্যে কে গাছে উঠতে যাবে বল। ·কার এত গরজ ?"

"বলিস ত উঠি না হয়।"

একেবারে শিউরে উঠল নীনা, বলল—"রক্ষে করো! শেষকালে ডাল ভেঙে হুড়মুড়িয়ে···"

বিপদের চরমটা আর বলে শেষ করল না।

দাঁতে নখ খুঁটতে খুঁটতে কি একটা ভাবছে চন্দোর। বার দুই আড় চোখে চাইল নীনা, তারপর বলল—"তাও বুঝতুম—হ্যাঁ, কতকগুলো রয়েছে একসঙ্গে। মোটে ত একটি।"

চন্দোব একটু মুচকি হেসে চাইল ওর দিকে ; বীরুর দিকেও, বলল—"একটি বলেই ত আরও মজা। চমৎকার একটা ইয়ে হয়। এই এক্ষুনি পড়ে আসছি।"

—সাতমহলা রাজাব পুবী। তার একেবারে মাঝখানেবটিতে সোনাব পালঙে মখমলের গদিতে শুয়ে আছেন কেশবতী রাজকন্যে। হাসলে তাঁব ঠোঁটে হীরে ঝরে, কাঁদলে চোখ বেয়ে পড়ে মুক্ত।

পড়ত বলাই ঠিক, কেন না রাজকন্যা এখন হাসেনও না কাঁদেনও না। সে এক বড় দুঃখের কাহিনী। একদিন রাজপুরীতে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হলেন, বললেন—"মহারাজ, আমি সাবা পৃথিবী ঘুবেছি, বহু আশ্চর্য জিনিস সব দেখেছি—ভগবান কত সুন্দব আব কত সব আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস সৃষ্টি করেছেন এই দেখে বেড়ানই আমার জীবনেব ব্রত। ঘুবতে ঘুবতেই পাশের রাজ্যে শুনলাম আপনার মেয়ে নাকি তাঁর সৃষ্টিব মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর—তার নাকি হাসিতে হীবে ঠিকরে পড়ে, কান্নায় মুক্ত ঝরে। আমি তাকে দেখতে চাই একবারটি। যে ভগবানের এত দয়া পেয়েছে সে মহা পুণ্যবতী, তাকে আশীর্বাদ করে যেতে চাই আমি।"

রাজা ত মহা খুশী, সন্ন্যাসীকে আদর-অভ্যর্থনা করে বসিয়ে কেশবতীকে নিয়ে আসবার জন্যে ভেতরে খবর পাঠালেন।

ফল কিন্তু হ'ল উল্টে। রাজার মেয়ে, তিনি সাতমহলা পুরীর মধ্যেই মানুষ হয়েছেন, নিজেও যেমনি সুন্দর তেমনি মন্দ কিছু দেখেন নি, মন্দ কিছুর কথা শোনেন নি জীবনে। হঠাৎ, মাথা থেকে চারদিকে দড়ির মতন কি ঝুলছে, খালি গায়ে এক গা চুল, একটা হরিণের ছাল পরা একটা লোককে দেখে শুধু প্রণাম করতেই ভুলে গেলেন না, হাসিও পারলেন না সামলাতে, আর সে হাসিতে হীরের টুকরো ছিটকে ছিটকে পড়তে লাগল চারিদিকে।

সন্ন্যাসীর চোখে আগুন উঠল জ্বলে।···কী! আমায় দেখে উপহাস্যি, এত দেমাক! তোর হাসি-কান্না দুই-ই আজ থেকে রইল বন্ধ। তুই অর্ধেক অচৈতন্য হয়ে থাকবি পড়ে, শুধু নিজের পাপের কথাটুকু থাকবে মনে, এদিকে না থাকবে কথা, না থাকবে ঠোঁটে হাসি, না থাকবে চোখে কান্না।

যেন বজ্রাঘাত হ'ল অমন সুখের রাজপুরীতে। রাজা পায়ে লুটিয়ে পড়লেন সন্ন্যাসীর, বললেন—"ভালোমন্দ কিছুই জানে না মেয়ে—যা করেছে তা উপহাস্যি নয়, পুরীর বাইরে পৃথিবীর কিছু দেখে নি বলেই তার এই দশা, সে একেবারেই নিরপরাধিনী, তাকে মাপ করুন সন্ন্যাসী।" অনেক করে বলতে, অনেক কান্নাকাটি করতে মনটা ভিজল সন্ন্যাসীর। বললেন—"বেশ, যা বলে ফেলেছি তা মিথ্যা হবে না; তবে এক উপায় বলে যাচ্ছি, দেখো যদি সম্ভব হয়। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে অমুক রাজ্যে দুর্গম পাহাড়ে ঘেরা একটা প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। বিশাল বিশাল অজগর, বিশাল বিশাল কুমীরে ভরা সেই হ্রদের মাঝখানটিতে একটি ছোট্ট দ্বীপ, তার মাঝখানটিতে একটি বিশাল গাছ—তার মাথা গিয়ে আকাশে ঠেকেছে একেবারে—সেই গাছের একেবারে মগডালে একটি মাত্র হীরে-মোতির ফল—কত মানুষ তার লোভে যে সেই হ্রদে প্রাণ দিয়েছে তার হিসেব নেই। কেউ যদি সেই হীরে-মোতির ফল তুলে নিয়ে এসে তার রস নিঙড়ে রাজকন্যার মুখে দিয়ে দিতে পারে, তবে তার মুখে আবার কথা ফিরে আসবে; ঠোঁটে হীরে-ঠিকরানো হাসি ফুটবে, চোখে মুক্ত-ঝরা কান্না দেখা দেবে।"

এর জন্যে রাজার দিক থেকে কিন্তু কোন চেষ্টাই করা হবে না। কেন না যে এই ফল এনে দিতে পারবে তার হাতেই কন্যাকে সমর্পণ করতে হবে।

আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগা হয়ে সোনার পালঙে শুয়ে আছেন কেশবতী কন্যে। শুকনো মুখে হাসি নেই, শুকনো চোখে একটা উদাস দৃষ্টি—কী পাপে আমার এ দশা?—কে আমায় সেই হীরে-মোতির ফল এনে দিয়ে আবার আমায় তোমাদের জগতে ফিরিয়ে নেবে গো? কী করে? কবে?

নিঝুম পুরী, কারুর মুখেই নেই আর হাসি, কেঁদে কেঁদে চোখের জলও শুকিয়ে গেছে সবার চোখে।

কেশবতী কন্যাকে বাঁচিয়ে তুলে তাকে পাওয়ার লোভে কত লোকে কুমীর অজগরের হ্রদে প্রাণ দিলে—শেষকালে দূর-রাজ্যের রাজপুত্র স্বপনকুমার তাঁর বন্ধু কোটালপুত্র অরূপকুমারকে সঙ্গে করে, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে···

বীরু বলল—"আমি রাজপুত্র স্বপনকুমার হব, কামরাঙাটা—মানে, হীরে-মোতির ফল পেড়ে আনছি গাছে উঠে।"

"বাঃ, আমি যে গল্পটা শোনালুম!"

"আহা, গল্প না শুনলে যেন পাড়তুম না! বলে, যাচ্ছিলুমই উঠতে গাছে, সুদো বরং নীনাকে···"

নীনা অতটা পক্ষপাতিত্ব অবশ্য করল না, তবে সমাধান করে দিল একটা। বলল—"খেলাই যখন, মিলেমিশে করাই ভালো নয় ভাই? তুই গল্পটা বললি, বীরু উঠল গাছে। তুই হলি অরূপকুমার, বীরু হ'ল স্বপনকুমার। অরূপকুমার নামটিও বেশি মিষ্টি যেন। আমি ত তাই বলব।"

সাতমহলা পুরীর মধ্যে ঢুকে সোনার পালঙে গিয়ে শুলে অবশ্য চলবে না, বিপদ আছে ত? খিড়কি থেকে বেরিয়েই ডানদিকে গোয়াল ঘর। বুধীকে মাঠে চরাতে নিয়ে গেছে, তারই সিমেন্টের নাদাটায় মোটা করে বিচালি বিছিয়ে তার ওপর বুধীর গায়ের চটটা পেতে মখমলের গদি করে দেওয়া হ'ল। কেশবতী কন্যা একটু গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়ে বলল—"যখন উঠছিসই কষ্ট করে বন্ধু কোটালপুত্রের গল্প শুনে, তখন একটু খুঁজেপেতে দেখবি আরও আছে কিনা; নষ্ট হবে ঝরে পড়ে। পোড়া কাকেদের যা উপদ্রব!···আর শোন্, সত্যি রস নিঙড়ে দিতে যাস নে যেন।" মুখে জল এসে পড়ায় একটা ঝোলটানা শব্দ করে বলল—"এই চুপ করলুম আমি।"

দু'জনের দিকে চেয়ে একটু মুক্তঝরা হাসি হেসে ঠোঁট দুটি চেপে দিল।

কোটালপুত্র অবশ্য আর বন্ধু রইল না। মুখটা গোঁজ করে ঘাটের রাণায় গিয়ে চুপটি করে বসে রইল খানিক্ষণ, তারপর রাজপুত্র যখন পুকুরটার চারিদিকে সাতবার চক্র দিয়ে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে হীরে-মুক্ত ফলের গাছে চড়তে যাবে, সেও আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে পড়ল।

না, নামটা আর করে নি চন্দোর। মগডালেও চড়ে নি তখন বীরু, তা'হলে আর বোধ হয় কিছু বাকি থাকত না। আধা-আধি চড়েছে এমন সময় কানে গেল—"ওগো, উঠে দেখো এসে কে যেন তোমাদের কামরাঙা গাছে চড়েছে !!"

সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামশাইয়ের গলা—"কে রে? দাঁড়া, আসি !!"

নেহাৎ পৌঁছায় নি মগডালে, তাই, নইলে হীরে-মোতির ফল পাড়তে গিয়ে আর সবারই যা হয়েছে তাই হয়ে যেত, পুরোপুরিই মিলে যেত গল্পটা।··· বীরুর যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখে সে নীনার জ্যাঠাইমার কোলে ঘাটের বেঞ্চের ওপর, জলের ঝাপটায় মাথা ভিজে, গেঞ্জি জামা সব ভিজে; হাতের মাঝখানে একটা কনকনানি, নীনার মা নীচেয় বসে হাতটা তুলে ধরেছেন।

চারিদিকে ভিড়; বাড়ির সবাই বেরিয়ে এসেছে। প্রশ্ন, প্রশ্নের আকারেই তিরস্কারও কিছু কিছু। তার সঙ্গে আহা-গো, বাছারে!—ও আছে। নীনার জ্যাঠাইমার গলা—"গেল বাড়িতে খবর দিতে কেউ?···কত দেরি হচ্ছে রিকশা ডেকে আনতে? হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তোলা দরকার আগে যে, কি হ'ল, না হ'ল!···"

চোখ আবার জড়িয়ে আসছে বীরুর; কান্না পাচ্ছে।···মা এসেছে, চোখে আঁচল, বাবাও এসেছেন।···দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল সবাই। শুধু যেন মার গলা—"না, একবারটি বাড়ি নিয়ে চলো, বাছা আমার আর ফিরবে কিনা···"

বাড়ির সদরে ভিড় নেই। বাড়িটা ওদের একটেরেও ত। বাড়ির মধ্যে থেকে হাঁটতে হাঁটতেই বেরিয়ে এল, বাবার গায়ে ভর করে। মা গায়ে ডান হাতটা রয়েছে চেপে, বাঁ হাতে আঁচল তুলে চোখ মুছছে। বাবা বললেন—"অত হেদোয় না, তবে ফাঁড়া কেটে গেল একটা বটে!"

একটু দাঁতে চেপে বললেন—"শুধু ক'টা ফাঁড়া যে কাটাতে পারবেন, সেইটাই জানি না।"

রিকশায় উঠে বসল, পাশে বাবা। মার ভুল হয়ে গেছে, যেমন প্রায়ই হয়। বলল—"এই দেখো মরণ আমার! মা চণ্ডীর ফুল দোব একটু যে!"

বাবা একটু রেগে বললেন—"শীগগির।" তারপর দেরি হচ্ছে দেখে ডাকলেন, তারপর নেমে পড়ে গজ্‌গজ্‌ করতে-করতে তিনিও চলে গেলেন ভেতরে, রিকশাওলাটাকে পাশে দাঁড় করিয়ে।

ভালোই হ'ল একরকম; নীনারা এসে পড়েছে; নীনা আর চন্দোরও। শুকনো মুখ ছুজনের। নীনার মুখের কথা, ঠোঁটের হাসি, চোখের জল কি সত্যিই মিলিয়ে গেল জটাধারী সন্ন্যাসীর শাপে?...চন্দোরের ওপরও আর রাগ নেই বীরুর—আহা বেচারি! তার দোষেই ত এরকমটা হ'ল!

কি বলবে কি করবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না বীরু। কিছু যেন বলতেই হয়। তার নিজের জন্যেও, ওদের দু'জনের জন্যেও—একটু দুঃখ, একটু সান্ত্বনা, একটু হয়তো আক্রোশও চন্দোরের ওপর।...বাবা, মা বেরিয়ে আসছেন।

কথাও বেরুল বীরুর—"এ বেশ হ'ল ভাই, না?...মিথ্যে মিথ্যে খেলতে খেলতে কেমন সত্যিই হাসপাতালে যাচ্ছি?"

কেশবতী কন্যার চোখে মুক্ত ঝরল, ঠোঁটে ছুটি হীরের কুঁচিও।